সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার নতুন ই-মেল আইডি
sangramihatiar@gmail.com
পত্রিকা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এই মেল আইডি-তে পাঠানোর জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

লবণহ্রদে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী

জুন '১৮ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ দ্বিতীয় সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

২৬-২৭ জুন ২০১৮
রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৬-২৭ জুন, ২০১৮ রাজ্যব্যাপী ব্লক স্তর পর্যন্ত ৫ দফা দাবিতে ব্যাজ পরিধান ও বিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঐ দু'দিন কর্মচারী বন্ধুরা দপ্তরে দপ্তরে ৫ দফা দাবি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান করবেন এবং দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। সংগঠনের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এবং কলকাতার অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়। জেলা কমিটিগুলির পক্ষ থেকে যেমন এই কর্মসূচীকে সামনে রেখে একেবারে প্রত্যন্ত ব্লক পর্যন্ত প্রচারে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনই অঞ্চল কমিটিগুলিও সেক্টর ভিত্তিক প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। শুধুমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক কমিটিগুলি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা নয়, অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সমিতি সমান্তরাল প্রচারের কর্মসূচী ও সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিভিন্ন জেলা কমিটি কর্মসূচীর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই যেমন কর্মচারীদের কাছে

পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২ জুন জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী

ড. অসীম দাশগুপ্ত

শুধু বেতন বৃদ্ধির ঘোষণাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন না। বকেয়ার দাবিও রাখবেন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার যে সময় থেকে বেতন কমিশন চালু করেছিলেন, রাজ্য সরকারকেও সেই সময় থেকে ষষ্ঠ বেতন কমিশন চালু করার দাবি করতে হবে। যার অর্থ ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যদি বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণাও হয়, রাজ্য কর্মীদের তা কার্যত দিতে হবে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে। আমাদের সরকারের সময়ও আমরা এই বকেয়া দিয়েছিলাম। এক বছরে দিতে পারিনি। তিন বছর ধরে তা দেওয়া হয়েছিল, যদিও ২০১১ সালে নতুন সরকার এসে শেষ কিস্তির টাকা দুভাগে অর্থাৎ একবছরের টা দুবছরে দিয়েছিল। গত সাত বছরধরে ধারাবাহিকভাবে এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীসহ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপক সকলেই আর্থিকভাবে চরম বৈষম্যের স্বীকার। এই প্রসঙ্গ তুলেই বিগত ১২ জুন কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিবাদ দিবস এর সভায় উপরোক্ত কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন আহুত জাতীয় প্রতিবাদ দিবস এর রাজ্য স্তরের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী বিগত ১২ জুন কলকাতা কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য। অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও চালু করা সহ বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান, চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিত করণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন প্রদান, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা, ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা, পূর্বের ন্যায় সংজ্ঞায়িত পেনশন চালু করা সহ ৮ দফা দাবিতে প্রতিবাদ সভায় দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, ৫-৮ এপ্রিল সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী

সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার
কর্মচারীদের পেনশনে কোপ

ত্রিপুরায় নব-নির্বাচিত বিজেপি সরকারের ঝুলি থেকে অবশেষে কর্মচারী স্বার্থবিরোধী বেড়ালটা বেরিয়েই পড়লো। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকরণে ঐ রাজ্যেও চালু হতে চলেছে নয়া পেনশন প্রকল্প। সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে (বিজ্ঞপ্তি নং- এ ফ৮ (১)-এফআইএন (জি) /২০০৪ (পি১) এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে ২০১৮ সালের ১লা জুলাই ও তার পরবর্তী সময়ে যারা রাজ্য প্রশাসনে নিযুক্ত হবেন তারা আর পূর্বের ন্যায় বিধিবদ্ধ পেনশন ব্যবস্থার আওতায় থাকবেন না। তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অনুকরণে চালু হবে কনট্রিবিউটরি পেনশন প্রকল্প। যার অর্থ হল প্রতিটি কর্মচারীর বেতন থেকে প্রতিমাসে ১০ শতাংশ টাকা কেটে নেয়া হবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও সমপরিমান টাকা কর্মচারী পিছু প্রদান করা হবে। যেগুলি পেনশন এ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। এই পেনশন এ্যাকাউন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন রেগুলেটারি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এই স্কিমের অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীরা জি পি এফ-র সুযোগ পাবেন না। নয়া পেনশন প্রকল্প ১ জুলাই ২০১৮ বা তার পরে যাঁরা সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত হবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযুক্ত হবে। এমন কি স্থায়ী পদগুলির পরিবর্তে যে সমস্ত ফিক্সড-পে পদ সাময়িকভাবে তৈরি করা হয়েছে, সেই সমস্ত পদেও এই সময়কালে যারা নিযুক্ত হবেন তাদের ক্ষেত্রেও এই প্রকল্প কার্যকরী হবে।

নয়া পেনশন প্রকল্পে দুটি স্তর থাকবে। স্তর-১ এবং স্তর-২। স্তর-১ বাধ্যতামূলক, স্তর-২ কর্মচারীর স্বেচ্ছাধীন এবং এই স্তরে গচ্ছিত অর্থ ব্যবহারও হবে কর্মচারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক। স্তর-১ এ মূল বেতনের ১০ শতাংশ প্রতি মাসে কেটে রাখা হবে। ট্রেজারি অফিসার/ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার এর দায়িত্ব হবে এই অর্থ কেটে নেওয়ার। সরকারও কর্মচারী পিছু সমপরিমান অর্থ প্রদান

তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কেন্দ্রীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা-২০১৭

বিষয় ঃ **ভারতে মৌলবাদের স্বরূপ ও উত্তোরণের পথ**

প্রথম ঃ *রুদ্রিকান্ত ভট্টাচার্য্য*
(কৃষি কারিগরি কর্মী সংস্থা)

দ্বিতীয় ঃ *তপন চক্রবর্তী*
(পঃ বঃ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতি, বাঁকুড়া জেলা)

তৃতীয় ঃ *রাজদীপ দত্ত*
(পঃ বঃ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি, জলপাইগুড়ি জেলা)

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচী-২০১৮
১১আগস্ট ২০১৮ শনিবার বেলা ৩ টা
যুবকেন্দ্র (মৌলালী) কলকাতা
পরিবার পরিজন সহ সকলের আমন্ত্রণ রইল।

১৪-১৫ জুলাই ২০১৮
সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা

গত ১৪-১৫ জুলাই ২০১৮ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিজয়ওয়াড়াতে ১৬তম জাতীয় সম্মেলনের পর প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির সভা দুদিন ধরে গাম্ভীর্য পূর্ণ পরিবেশে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার আরম্ভে এ পি এন জি - ও এসোসিয়েশনের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আমানাগনতি শ্রী রামালুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অশোকবাবু সভায় উপস্থিত সদস্যদের অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বাগত ভাষণ রাখেন।

পরবর্তী সময়ে সাধারণ সম্পাদক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির উপর ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রাখেন। সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে। মন্দার প্রভাব সর্বত্র। শ্রমিক কর্মচারী শ্রমজীবীদের জীবনধারণ আক্রান্ত। পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারী সাধারণ মানুষ লড়াই করছে। বামপন্থীরা নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে। খোদ আমেকিায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। দেশের বি জে পি সরকার নয়া উদারনীতির গতি বৃদ্ধি করছে। লড়াইও হচ্ছে তীব্র। সাম্প্রদায়িকতার বিপদ দেখা দিচ্ছে, বামপন্থীরা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে নিয়ে ভয়াবহ আক্রমণের মোকাবিলা করতে বিকল্প ভাষ্য তুলে ধরছে দেশের ঐক্যকে রক্ষার স্বার্থে। লড়াই হচ্ছে। আগামীদিনে বৃহত্তর সংগ্রামে যেতে হবে।

আমাদের জ্বলন্ত সমস্যা (১) ন্যাশনাল পেনশন স্কীম (২) চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের চরম শোষণ। এই আক্রমণের প্রতিবাদে আমাদের ধর্মঘটে যেতে হবে।

এছাড়া তিনি বিভিন্ন রাজ্যের পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাসের বিষয় উল্লেখ করেন। গত ১২ জুন, ২০১৮ জাতীয় প্রতিবাদ দিবস সর্বত্র সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া ষোড়শ জাতীয় সম্মেলনের পর্যালোচনা রিপোর্ট রেখে বক্তব্য পেষ করেন। পরের দিন মহিলা অধিবেশন প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় মহিলা উপ-সমিতির আহ্বায়িকা বিন্থ কুমার সিং। এরপর দু'দিন ধরে ১৯টি রাজ্য থেকে ১০ জন মহিলাসহ মোট ২৯ জন কার্যনির্বহী কমিটির সদস্য সভায় স্ব স্ব রাজ্যের পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক কর্মসূচীর বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও সুতপা হাজরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরে সাধারণ সম্পাদক শ্রীকুমার সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য পেশ করেন। সর্বভারতীয় সংগঠনের চেয়ারম্যান এস লাম্বা সহ সভাপতিমণ্ডলী দু'দিন ধরে সভা পরিচালনা করে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

নয়া উদারবাদ, নির্বাচন ও জনগণ

আমাদের দেশে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে। নির্দিষ্ট সময়ে হলে, তা সামনে বছর (২০১৯) মে-জুন মাস নাগাদ হওয়ার কথা। তবে শোনা যাচ্ছে নির্বাচন দু-একমাস এগিয়েও আনা হতে পারে। সে যাইহোক, দু-একমাস আগে বা পরে যখনই হোক, নির্বাচন যে হবেই, তা নিশ্চিত। ফলে এখন থেকেই সমস্ত ধরনের গণমাধ্যমে 'লোকসভা নির্বাচন, একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। সেটা স্বাভাবিকই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সমস্ত আলোচনার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আগামী নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল কি হতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত। বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় থাকবে কি না, থাকলেও কতটা শক্তিক্ষয় হতে পারে, বিরোধীদের সম্ভাবনা কেমন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, এইসব আলোচনার সিংহভাগের মধ্যেই (ব্যতিক্রম অবশ্যই কিছু রয়েছে), 'নীতি' প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এক কথায় নীতিহীন রাজনীতির চর্চা চলছে। এইসব আলোচনা দেখে-শুনে মনে হবে যেন লোকসভা নির্বাচন নয়, সামনে বোধহয় কোন মল্লযুদ্ধের আসর বসতে চলেছে। যেখানে মোদি বনাম গান্ধী এক জবরদস্ত লড়াই হবে। এই লাইনে প্রচারে স্বনামখ্যাত বিশেষজ্ঞগণও জুটে গেছেন। কি কি কারণে ব্যক্তি মোদি ব্যক্তি গান্ধীর থেকে এগিয়ে, কার কোন্‌টা প্লাস পয়েন্ট, কে কোথায় পিছিয়ে ইত্যাদি নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলছে বিস্তর। মাঝে মাঝে কোন কোন আলোচনায় এই দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রের আশেপাশে পার্শ্বচরিত্রের মতন কয়েকটি মুখ ভেসে উঠছে। যার মধ্যে আমাদের রাজ্যের অধিশ্বরীও রয়েছেন। এইসব পার্শ্বচরিত্ররা নিজেরাই জোট করবেন, নাকি দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রের কোন না কোন দিকে ভিড়বেন, তা নিয়ে এখন থেকেই বিশেষজ্ঞদের কপালে বিস্তর চিন্তার ভাঁজ। আবারও বলতে হয়, এইসব ইনটেলেকটে ভরপুর আলোচনায়, সব রয়েছে, পক্ষপাতিত্বতো রয়েছেই, শুধু নেই 'নীতি'।

নীতিতো নেই-ই, এমনকি জনগণও এখানে গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকমাত্র। যাদের বোধহয় হাততালি দেওয়া ছাড়া কোন কাজ নেই। অথচ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক পড়ে আমরা জেনেছি, যেকোন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, নির্বাচন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে 'জনগণ'। কারণ গণতন্ত্র মানে লিংকন সাহেবের কথায়, ''ফর দ্য পিওপল্, অফ দ্য পিওপল্, বাই দ্য পিওপল্।'' জনগণ সব দেখে-শুনে পড়ে-বুঝে এবং তার সাথে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে, তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, ঠিক করবেন কে বা কারা তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে দেশ বা রাজ্য চালাবেন। আবার এই চালানোর কাজটাও কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। অর্থাৎ একবার জনগণ দায়িত্ব দিয়েছেন বলে আমৃত্যু পায়ের উপর পা তুলে সিংহাসন ভোগ দখল করব তা'ও নয়। জনগণের চাহিদা, আশা-ভরসাকে মর্যাদা দিতে না পারলে, ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে চলে আসতে হয়। চিরকালের জন্য না হলেও, কিছুদিনের জন্যতো বটেই। গণতন্ত্রের এই কপিবুক মডেল সর্বত্র দারুণ নিষ্ঠার সাথে অনুসৃত হয়, তা নয়। আমাদের দেশেও অতীতে সর্বদা তা হয়েছে বলা যাবে না। কিন্তু, স্পিরিটটা অন্তত বজায় থাকত। মানে পাঁচ বছরে বাকি সময়টা জনতা এলেবেলেও হলেও, নির্বাচনের কিছুদিন আগে থেকে জনতা জনার্দন।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির জনগনের প্রতি এই সিজন্যাল ভালবাসায় আন্তরিকতা নামমাত্র, বড়টাই ফাঁকি। তবুও অল্প সময়ের জন্য হলেও, নির্বাচনী মঞ্চের ঠিক মাঝখানে আলোর ফোকাসে জনগণ ঠাঁই পেতেন। কিন্তু বিস্ময়কর হল, পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মিডিয়া যে প্রচারের বাতাবরণ তৈরি করেছে, একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, যেখানে জনগণের সেন্টার লাইনে এসে দাঁড়ানো তো দুরের কথা, এখনও পর্যন্ত মাঠে নামারই সুযোগ পাননি। গ্যালারিতে, অথবা বড়জোর রিজার্ভ বেঞ্চে তাঁদের স্থান। নির্বাচন আরও এগিয়ে এলে হয়ত, ট্র্যাডিশনাল প্রচারের ধারা ফিরে আসবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রচারের এই নতুন ধারাটি লক্ষ্যণীয়। ঠিক যেমন সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে, ফুটবল বিশেষজ্ঞরা ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া দলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করছিলেন, তেমনই মোদিজী ও গান্ধীজী (মহাত্মা নন)-র মধ্যে বিবৃতি, ভাষণ আর ট্যুইটের লড়াই-এর মার্কশিট তৈরি করা হচ্ছে। কবে মোদিজী তাঁর প্রতিপক্ষকে শ্লেষ করে বিঁধলেন, আর কবে তাঁর প্রতিপক্ষ ল্যুজ বল পেয়ে ছক্কা হাঁকালেন, তাই নিয়েই প্রচার মাধ্যমে আহ্লাদেপনা চলছে। যেন জনগণের সামনে অপশন রাখা হচ্ছে—গ্যালারিতে বসে ডুয়েল ফাইট দ্যাখ, আর বেছে নাও 'অরণ্যদেব' নাকি 'সুপারম্যান' কাকে পছন্দ। এ যেন ফুটবল ময়দানে মেসি-রোনাল্ডো দ্বৈরথের মত, মোদি-গান্ধী দ্বৈরথ— এল ক্লাসিকো। আর আশেপাশে বল পাস বাড়ানোর জন্য পট্টনায়েক, ব্যানার্জী, যাদব, নাইডু ইত্যাদি। নীতিহীন, জনতা-বিহীন রাজনীতি যেন মাথায় ভর দিয়ে হাঁটছে। ঠিক যেমন হেগেলের দ্বন্দ্ব তত্ত্ব সম্পর্কে মার্কস বলেছিলেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাক্-প্রাক্ নির্বাচনী প্রচারের এই মডেল, কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী প্রচারের মডেলে পরিণত হয়েছে গত কয়েকবছর ধরে। কিন্তু মডেলটা একই হলেও, এ রাজ্যের ক্ষেত্রে তার ওপরের রঙের পালিশটা একটু ভিন্ন। এখানে একদিকে একজন ব্যক্তি ও তাঁর দল, আরেকদিকে শুধুই দল। কারণ অপরদিকে তেমন হেভিওয়েট এখনও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মোদিজীকে জাতীয় লীগ থেকে বের করে এনে ঘরোয়া লীগে খেলানো হচ্ছে বটে; কিন্তু 'লিয়েন'-এ নিয়ে এসে তো সারাবছর খেলানো যায় না। বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ টুর্নামেন্টে মাঠে নামিয়ে কাজ চালানো যায় বটে, কিন্তু স্থানীয় হেভিওয়েট না পাওয়া পর্যন্ত, একদিকে ব্যক্তি ও উল্টোদিকে দল— এই দুইয়ের টক্করকেই কলমের মুন্সীয়ানায় ব্যোমকেশ অমনিবাশের মতো আকর্ষণীয় করার চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যা প্রাক্-প্রাক্ নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি, তা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে স্থায়ী স্ট্র্যাটেজি কেন? কারণ এ রাজ্যে বেশ বড় সংখ্যায়, ভাল শক্তি নিয়ে (তা রক্তক্ষরণের গল্প যতই বলা হোক না কেন) বেয়ারা বামপন্থীদের উপস্থিতি। যারা আবার নীতিহীন, জনতাবিহীন রাজনীতি বোঝে না। সব ব্যাপারেই জনগণকে টেনে রাস্তায় নামাতে চায়। সারের মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি — যাই হোক না কেন, বামপন্থীদের অভ্যাস হল পোস্টার, স্লোগান, লিফলেট নিয়ে জনতার আদালতে পৌঁছে যাওয়া। আর, এটা অ্যালাউ করলে তো অদূর ভবিষ্যতে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে। কারণ বামপন্থীরা যদি বারবার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে, তাহলে সুপরিকল্পিতভাবে জনগণের চারপাশে তৈরী করা মিথ্যের মোহজাল, যার পোশাকি নাম 'উত্তর-সত্য' বা 'পোস্ট-ট্রুথ', একটু একটু করে ছিঁড়ে যাবে। যা হতে দেওয়া যায় না। তাই জনগণকে বোঝানো, বামপন্থীরা ময়দানে নেই, তোমরা গ্যালারিতে বসে, যারা ময়দানে আছে, এমন দু'পক্ষের (ফেক) যুদ্ধ দ্যখ, আর ঠিক কর কোন পক্ষে যাবে।

এই যে প্রচারের একটি নতুন ধারা, যেখানে 'নীতি' অপ্রাসঙ্গিক, জনস্বার্থ গুরুত্বহীন, তা আমদানি করার উদ্দেশ্য কি? নয়া উদারবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করলেই এর উদ্দেশ্য বোঝা যায়। নয়া উদারবাদের তাত্ত্বিক সংজ্ঞা হল— রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে হ্রাস এবং বাজার সর্বস্বতা। কিন্তু এই সংজ্ঞা আসলে লোক-ঠকানো সংজ্ঞা। কারণ নয়া উদারবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস পায় না, জোরালোভাবেই থাকে। তবে এই ভূমিকা পালিত হয় আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির স্বার্থে, কর্পোরেটদের স্বার্থে। জনগণের স্বার্থে নয়। স্বভাবতই নয়া উদারবাদী জমানায় রাষ্ট্র যখন জনগণের স্বার্থে ভূমিকা পালনে দায়বদ্ধ নয়, তখন শুধু শুধু প্রাক্-প্রাক্ নির্বাচনী পর্যালোচনা-আলোচনায় জনগণকে টেনে আনার প্রয়োজন কি? আর নীতিই যখন অপরিবর্তিত থাকবে, তখন 'নীতি' নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করারই বা প্রয়োজন কি? বরং কোন্ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের মাথায় বসালে, নয়া উদারবাদ আরও জাঁকিয়ে বসতে পারবে, তা পরখ করে দেখাটাই জরুরী নয় কি? মনে আছে, ঠিক যেমন এক সময় মনমোহন সিং-এর প্রতি প্রেম উধাও হয়ে গিয়ে, মোদি প্রেমে গদ গদ হয়ে উঠেছিল কর্পোরেট পুঁজি?

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নির্বাচন এগিয়ে এলে তো আর জনগণকে সাইড লাইনের বাইরে রাখা যাবে না। কারণ আম্বানি, আদানি আর ওয়ালমার্টের সি ই ও-র ভোটে তো নির্বাচনে জেতা যাবে না। ফলে তখন প্রচারের থিম পাল্টে যাবে, বেশকিছু 'জুমলা' (যেমন বছরে ২ কোটি চাকরি) বাজারে ছাড়া হবে। কিন্তু সেটা কি যথেষ্ট? জনগণ যদি তাঁদের অভিজ্ঞতার নিরিখে 'জুমলা'গুলিকে বিচার করেন? ঐ বামপন্থীরা, যেখানে যতটুকু শক্তি আছে, তা নিয়ে মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলে? নির্বাচনী বাধ্যবাধকতায় জনগণকে তো ময়দানে নামাতেই হবে। তখন যদি তাঁদের চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা কেটে গিয়ে, সক্রিয় হয়ে ওঠে? তাঁরা যদি বিকল্প ব্যক্তি নয়, বিকল্প নীতির কথা বলেন?

কুছ পরোয়া নেহি অব্যর্থ দাওয়াই রয়েছে—রাজনীতির 'লুম্পেনাইজেশন'। রসদ তো আছেই। বিশাল বিপুল বেকার বাহিনী। কোথাও মা-মাটি-মানুষের নামে, কোথাও 'অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড' বা 'গোরক্ষক বাহিনীর' নামে, এদেরকে হিংস্রতার প্রশিক্ষণ দিয়ে আন্দোলনরত জনগণের পিঠে লাঠি ভাঙ্গো। ভয় শুধু ভয় তাড়া করুক মানুষকে। ব্যাস তাহলেই কেল্লা ফতে। কারণ ভীত-সন্ত্রস্ত জনগণ আর সবকিছু ছেড়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার নিরাপত্তাটুকু চাইবেন।

তবে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষা হল, এই পরিকল্পনা ও প্রচার সাময়িক ফলদায়ী হতে পারে। কিন্তু চিরস্থায়ী হয় না। কারণ গণচেতনা ঘুমন্ত আগ্নেয় গিরির মতন, কখন যে উদগীরণ হবে কেউ জানে না। কিন্তু হলে তাকে রোখা দায়। ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই এর সন্ধান মিলবে। এমনকি সাম্প্রতিক বিশ্বে এর সন্ধান মিলছেও। দীর্ঘস্থায়ী সংকটের ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়া নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে জনরোষ ধূমায়িত হচ্ছে, খোদ উদারবাদের জন্মস্থান পশ্চিমী দুনিয়ায়। এমনকি বিশ্ব অর্থনীতির পাণ্ডা দেশগুলির ভাই-ভাই ভাবও উধাও। আপন স্বার্থে দ্বন্দ্ব ও কলহে জড়িয়ে পড়ছে তারা। তাই হতাশার কোন জায়গা নেই ... । □

২৩ জুলাই,২০১৮

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যনির্বাহী সভা

সিদ্ধান্ত ঃ — (১) আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সর্বভারতীয় ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচীতে সর্বভারতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে সব রাজ্যগুলিকে অংশগ্রহণ করতে হবে। (২) আগামী ১৫ নভেম্বর ২০১৮ নয়া পেনশন স্কীম বাতিল ও চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের সম কাজে সম বেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মত সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবিতে সারা দেশ জুড়ে স্ব স্ব রাজ্যে ধর্মঘট করতে হবে। (৩) টি ইউ আই পাবলিক সার্ভিসেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ১১ ও ১২ মে ২০১৮ সাঁইপ্রাসে অনুষ্ঠিত হয়। আগামীদিনে আরো ঐক্যবাদ্ধ লড়াই এর শপথ নেওয়া হয় ঐ সভায়। (৪) সর্বভারতীয় সংগঠনের হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং ফান্ড-এর সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানো হয় এবং যারা এখনও অর্থ প্রদান করেননি, অবিলম্বে তা জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়। অতি দ্রুত হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং-এ কাজ শুরু করার জন্য উদ্যোগ ও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। (৫) এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং বকেয়া গ্রাহক চাঁদা অতিসত্ত্বর জমা দিতে বলা হয়। (৬) আগামী ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ সর্বভারতীয় সংগঠনের উদ্যোগে জাতীয় মহিলা কনভেনশন মহারাষ্ট্রের নাসিকে অনুষ্ঠিত হবে। (৭) যে কোন পরিস্থিতিতে কর্মসূচী গ্রহণ ও তা কার্যকরী করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি সর্বত্র গড়ে তুলতে হবে। □

শোক সংবাদ

সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী

রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ, অধ্যাপক ও গণ আন্দোলনের নেতা কমরেড সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী গত ১৫ জুন, শনিবার নিজের বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মজীবনে অবসর নেন দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করার পর। তাঁর লেখা 'ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি' বইটি স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক। একই সঙ্গে আমাদের রাজ্য তথা সারাদেশের শিক্ষা আন্দোলনে, আমাদের রাজ্যের শিক্ষার প্রসারে তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রাজ্যের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুটার সাধারণ সম্পাদক এবং সারাভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (এ আই ফুকটোর) সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতির ভূমিকায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পনের বছর তিনি আমাদের রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। ১৯৮০ সালে তিনি বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী হয়ে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং সাংসদ হিসেবে দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তাঁর মৃত্যুতে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। □

মনিকা পাল

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সভাপতি কমরেড মনিকা পাল সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। কর্মচারী আন্দোলনের এই জনপ্রিয় নেত্রী নার্সিং কর্মচারীদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৭০ দশকে আধা ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসের কালে তিনি অকুতোভয়ে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করেছেন।

কমরেড মনিকা পাল সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রথম মহিলা উপ-সমিতির সদস্যা ছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর বাসস্থান এলাকা বেহালায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েন। কমরেড মনিকা পাল ছিলেন একাধারে সঙ্গীতপ্রেমী, বৃক্ষপ্রেমী এবং পক্ষীপ্রেমী। তাঁরই উদ্যোগে বেহালা অঞ্চলে সুচেতনা নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। অবসর গ্রহণের পর তিনি রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী চক্ষু দুটি দিশা আই ব্যাঙ্কে এবং দেহ এন আর এস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে তুলে দেয়া হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর স্বামী আগেই প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ এবং দৌহিত্রকে।

২৭ জুলাই ২০১৮ ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বপন চক্রবর্তী

১২ই জুলাই কমিটির সর্বোচ্চ স্তরের ওয়ার্কিং বডির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য, বিদ্যাসাগর মেলার অন্যতম সংগঠক কমরেড স্বপন চক্রবর্তী গত ১৭ জুন বিকেল ৪.৩০ মিনিটে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো বাষট্টি বছর। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি রক্তের সংক্রমণজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। ছাত্র- জীবন থেকেই তিনি প্রবল দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একদিকে সংসারের জন্য এবং নিজের পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব নেওয়া আর অন্যদিকে বামপন্থী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে বিভিন্ন লড়াই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। সত্তর দশকে আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় তাঁকে প্রথম আসাম এবং পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গে আশ্রয় নিতে হয় কিছুদিন। ১৯৭৮ সালে শিক্ষাদপ্তরে চাকুরী পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ স্কুলবোর্ড কর্মচারী (যা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মী সমিতি নামে পরিচিত) সংগঠনের কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দীর্ঘদিন দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর সুমধুর ব্যবহারের জন্যে তিনি শুধু তাঁর কর্মস্থলে নয়, তিনি যখন যেখানে থেকেছেন যেমন দমদম, এন্টালি বা বিধাননগর তার প্রত্যেকটি জায়গাতেই তিনি মেহনতি মানুষের লড়াই আন্দোলনের শরিক হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার জনপ্রিয়তার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে সফল হন। ১২ই জুলাই কমিটির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তার পরিবার পরিজনের কাছে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। □

প্রদীপ প্রকাশ পাণ্ডা

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সভাপতি কমরেড প্রদীপ প্রকাশ পাণ্ডা গত ১০ জুলাই ২০১৮ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র বর্তমান। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে কমরেড পান্ডা জন্মগ্রহণ করেন। কাঁথির প্রভাত কুমার কলেজ থেকে ইংরাজিতে এমএ পাশ করেন। প্রথমে কাঁথিতে সেটেলমেন্ট বিভাগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তমলুক এবং তারও পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আলিপুর মহকুমায় কর্মসূত্রে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির আলিপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক হন। পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে কমরেড পাণ্ডা সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। সমিতির ৫২-৫৩তম রাজ্য সম্মেলন থেকে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। কমরেড পান্ডা একজন দক্ষ সংগঠকের পাশাপাশি সঙ্গীত-প্রেমীও ছিলেন। তিনি নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা করতেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পেনশনার্স সমিতির কর্মী হিসেবে সক্রীয় ভূমিকা পালন করতেন। □

গ্রামীণ ডাক সেবকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের তাৎপর্য ও শিক্ষা

মানস কুমার বড়ুয়া

গ্রামীণ ডাক সেবকদের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনাজনিত ক্ষোভের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ ঘটল লাগাতার ১৬ দিনের সফল সর্বভারতীয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। ২২ মে, ২০১৮ থেকে ৬ জুন, ২০১৮ গ্রামীণ ডাক সেবকদের টানা ১৬ দিনের ধর্মঘট এতটাই ঐক্যবদ্ধ ও নিশ্ছিদ্র ছিল যে ফ্যাসিস্ত চরিত্রের বি জে পি-আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারও নতজানু হতে বাধ্য হল তাদের দাবি- দাওয়ার কাছে। ভারতের শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন মাইল স্টোন স্থাপন করলো এই ধর্মঘট। ১৯৯১ সাল থেকে ভারতে নয়া উদারনীতির আক্রমনের পর কোন কেন্দ্রীয় দপ্তরে এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জি ডি এস গ্রামীণ ডাক সেবক-দের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার জি ডি এস -দের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে আনতে অস্বীকার করে এই যুক্তিতে যে তারা স্থায়ী সরকারী কর্মচারী নয়। লাগাতার সংগ্রামের চাপে অবসরপ্রাপ্ত পোস্টাল বোর্ড সদস্য কমলেশ চন্দ্রের নেতৃত্বে জি ডি এস-দের সমস্যা সমাধানে সরকার পৃথক একটি কমিটি গঠন করে। বিচার্য বিষয়ের মধ্যে রাখা হয় তাদের ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে। যদিও ইডি কর্মচারীরা (জি ডি এস-দের পূর্বসূরী) স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই তাদের স্থায়ীকরণসহ অন্যান্য যে মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে সংগ্রাম করে আসছে সেই বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবারও। কমলেশ চন্দ্র কমিটি ২৮ নভেম্বর ২০১৬ কেন্দ্রীয় সরকারকে তার রিপোর্ট দেয়। জি ডি এস-দের ভাতা বৃদ্ধি, কম্পোজিট ভাতা প্রদান, শিক্ষা ভাতা প্রদান, চাকুরী জীবনে নির্দিস্ট সময় অন্তর তিনবার পদোন্নতির সুযোগ, মহলা জিডিএস-দের ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি, ৩৫ দিনের ছুটি ইত্যাদি বেশকিছু ইতিবাচক সুপারিশ উক্ত কমিটি করে। সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি জানায় ডাক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ফেডারেশন ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পোস্টাল এমপ্লয়িজ (এন এফ পি ই) এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন সারা ভারত ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন- জিডিএস। কিন্তু দীর্ঘ দেড় বছরের বেশী সময় ধরে আবেদন, বিক্ষোভ-অনশন ইত্যাদির পরও ভারত সরকারের উদাসীনতা তাদের ২২ মে ২০১৮ থেকে লাগাতার ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করে। দলমত নির্বিশেষে জি ডি এস-দের সব ধরনের সংগঠন এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। এন এফ পি ই ছাড়াও আরও দুটি পোস্টাল ফেডারেশন এফ এন পি ও এবং বি পি ই এফ এই ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি জানায়। একমাত্র কেন্দ্রীয় শাসক দলের অনুগামী বি এম এস, যাদের সদস্য মোট জি ডি এসের মাত্র ৪ শতাংশ এই ধর্মঘটের বিরোধীতা করে। যদিও তাদের অনুগামীদের বড় অংশই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। গ্রামীণ ডাক ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ে প্রথম দিন থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা সার্কেলে ২২-২৫ মে চারদিন সংহতিমূলক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে বিভাগীয় কর্মচারীরাও। কেরালা সার্কেলে এই ধর্মঘট হয় ৯ দিন ধরে। সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি, কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি ১২ই জুলাই কমিটি এই ধর্মঘটের প্রতি সংহতিমূলক কর্মসূচী নেয়। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও ধর্মঘটের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ডব্লু এফ টি ইউ এই ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানায়। কার্যত কোণঠাসা কেন্দ্রীয় সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এখানেই আন্দোলনের প্রতিবেদন শেষ করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারা এই জি ডি এস, কোন প্রেক্ষাপটে তাদের এই আন্দোলন তা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

ই ডি থেকে জি ডি এস

ডাক বিভাগের নিয়ন্ত্রনে দেশে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৮২ টি পোস্ট অফিস আছে। তার মধ্যে গ্রামীণ শাখাই হল ১৩৯১৮২। সর্বমোট ৫ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ৩ লক্ষ ৭ হাজার জি ডি এস, অর্থাৎ প্রায় ৬০ শতাংশ। এরা অধিকাংশই শাখা অফিসগুলিতে কাজ করে। এদের সরকারী কর্মচারীর স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। বলা হয় এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল (ই ডি) কর্মচারী, এদের নিয়মিত বেতন নেই, কাজের সময় হিসাব করে ভাতা দেওয়া হয়। এটা ঘোরাফেরা করে ২২৯০ টাকা থেকে ৪৫৭৫ টাকার মধ্যে। নিয়মিত কর্মচারীদের মত অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা এদের নেই। এমনকি শাখা পোস্ট মাস্টারকে নিজের পকেট থেকে অফিসের ভাড়া এবং বিদ্যুতের খরচ মেটাতে হয়। সমস্ত চাকুরি জীবনে এদের কোন প্রমোশনের সুযোগ নেই। এই বঞ্চনার ইতিহাস দীর্ঘদিনের।

গ্রামীণ ডাক সেবকদের অতীতে ই ডি (এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল) বলা হোত। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৫৪ সালে বিভাগীয় ডাক ব্যবস্থা চালু হবার আগেই জেলা শাসকের অধীনে দোকানদার কিংবা স্কুল শিক্ষকরা নামমাত্র পারিশ্রমিকে গ্রামাঞ্চলে শাখা অফিস পরিচালনা করতেন। সে সময় ডাক ব্যবস্থাই যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল। সরকারী চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থেও ব্রিটিশরাজ তাদের বিশ্বস্ত লোকেদের মূলত জোতদার, জমিদার পরিবারের সদস্যদের অল্প পারিশ্রমিকে এই পদে নিযুক্ত করতেন।

স্বাধীনতার পর ডাক ব্যবস্থারও ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইডি কর্মচারীরা ধীরে ধীরে জি ডি এস রূপে পরিচিতি পান। রোদ ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে এঁরা পরিষেবা দিয়ে যাবেন। বিভাগীয় কর্মীদের মত সব ধরনের স্থায়ী চরিত্রের কাজ করা সত্ত্বেও এরা বিভাগীয় নন সরকারী মতে এক্সট্রা। কারণ এঁদের নাকি আয়ের ভিন্ন উৎস আছে। অথচ বাস্তবে তা নয়। তলোয়ার কমিটি দেশজুড়ে তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছিল, ই ডি কর্মচারীদের ৯৫.৭ শতাংশ মূলত নির্ভরশীল ডাক ও তারের এই পেশার উপর। এই কমিটি আরও বলেছিল নব্বই দশকের মাঝামাঝি একজন কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর তুলনায় ইডি কর্মচারী কম মজুরী পান। এদে বিভাগীয়করণ সম্ভব।

বঞ্চনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্বাধীনতার পরে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ এমপ্লয়িজ (এন এফ পি টি ই) এবং ১৯৮৫ সালে ডাক ও তার বিভাগ ভাগ হবার পর ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পোস্টাল এমপ্লয়িজ (এন এফ পি ই)-এর নেতৃত্বে ডাক কর্মচারীরা ই ডি কর্মচারীদে বিভাগীয়করণ ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ধারাবাহিকভাবে লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করে আসছে। পরাধীন ভারতে প্রথম বেতন কমিশনের স্পষ্ট সুপারিশ ছিল ইডি কর্মচারীদের বেতনভাতার বিষয়টি বিভাগীয় কর্মীদের

গ্রামীণ ডাক সেবকদের টানা ১৬ দিনের শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা সাহসী ধর্মঘট দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে এক শিক্ষা। এই বার্তা সর্বত্র পৌঁছে গেছে যে যদি তিন লক্ষ জি ডি এস পারে তবে আমরা পারব না কেন ? সর্বোপরি এই রাজ্যের আর্থিকভাবে ও অধিকারগত ভাবে চরম আক্রান্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, আমরাও নিশ্চয় এই ধর্মঘট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব যে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং সাহসী মানসিকতা থেকেই সাফল্য আসে। আমরাও আমাদের শাসককে বুঝিয়ে দেব যে - আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে আমরাও পারি। সেই দিন আসছে।

মত বেতন কমিশনের আওতায় বিবেচনা করা হোক। খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ব্রিটিশরা ইডি দের 'গভর্নমেন্ট কন্ডাক্ট রুলস' এবং পোস্টাল রেগুলেশনের আওতায় নিয়ে আসে। স্বাধীন ভারতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেতন কমিশন এদের নিছক এজেন্ট আখ্যা দেয়। কিন্তু চতুর্থ বেতন কমিশন যথেষ্ট ইতিবাচক কথা বলেছিল। এই বেতন কমিশন বলেছিল, ভারত সরকার অনুমোদিত পদে স্থায়ী চরিত্রের কাজ করবার সূত্রে ই ডি-রা অবশ্য স্থায়ী কর্মচারী। ১৯৭৭ সালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেছিল ভারত সরকারের ব্যাখ্যা মত আগেই এঁরা এজেন্ট নন বরং সরকারী পদাধিকারী এর পরও আদর্শ নিয়োগ কর্তা, হিসাবে ইডি কর্মচারীদের প্রতি যথাযোগ্য সুবিচারের পরিবর্তে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কেবলমাত্র ডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড কন্ডাক্ট রুল'-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিল। ফলে স্ট্যাটাস, ছুটি, পেনশন এঁদের কাছে অধরাই থেকে যায়। এমনকি এঁদের স্ট্যাটুটারি কন্ডাক্ট রুলসে কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম ভুল-ভ্রান্তির জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা ছিল যা পরে সংশোধিত হয়।

ধারাবাহিক সংগ্রাম

১৯৯১ পরবর্তী উদারনীতির পর্বে ভারতে জি ডি এসদের মৌলিক দাবি-দাওয়া মেনে নেবার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারগুলি আরও বেশী অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছে। প্রতিক্রিয়ায়, ডাক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ধর্মঘটও তীব্রতর হয়েছে।

ব্যুরোক্র্যাট নয়, বিচারপতির কমিশনের দাবি ওঠে। ৭-১০ ডিসেম্বর ১৯৯৩ দেশব্যাপী সফল ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় তলোয়ার কমিটি। এই সময়পর্বে এ রাজ্যে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বিধানসভায় জি ডি এস-দের বিভাগীয়করণের দাবিতে সমর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হয়। পাশাপাশি বামপন্থী সাংসদরা তলোয়ার কমিটিকে চিঠি দিয়ে ইডি কর্মচারীদের বিভাগীয়করণ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে কিছু সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করে। ই ডি-সহ ডাক কর্মচারীদের দাবি দাওয়া বিবেচনায় গঠিত সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির অন্যতম সদস্য তৎকালীন বামপন্থী সাংসদ সুশীলা গোপালন ইডি কর্মচারীদের ভাতা নির্ধারনের ক্ষেত্রে সমকাজে সমবেতন এর নীতি গ্রহণের দাবি জানান। তিনি প্রশ্ন তোলেন কেরালা রাজ্য সরকার (তৎকালীন বামপন্থী সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও পেনশন চালু করেছে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার ই ডি কর্মচারীদের কেন পেনশন দিতে পারবে না?

তলোয়ার কমিটি, ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে জি ডি এস-দের স্ট্যাটাস, পে-স্কেল, পেনশন সহ অনেকগুলি ইতিবাচক সুপারিশ করেছিল যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এক তরফাভাবে তা উপেক্ষা করে। তার বিরুদ্ধে ৯-১৬ জুলাই ১৯৯৮ পুনরায় দেশব্যাপী ধর্মঘট হয়। আন্দোলনের চাপে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সহ ভাতা, তার উপর নির্দিষ্ট হারে মহার্ঘভাতা, সবেতন ছুটি প্রভৃতি লাগু হয়। কিন্তু মৌলিক দাবিগুলি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন চলে। ২০০০ সালে দেশব্যাপী ১৫ দিন ধর্মঘট হয়। তা সত্ত্বেও মৌলিক দাবিগুলির আজও সুবিচার হয়নি।

এরপর নটরাজন মুর্তি কমিটি এবং সর্বশেষ কমলেশ চন্দ্র কমিটি গঠন করে জি ডি এস-দের মাসিক ভাতার কিছু বৃদ্ধি ঘটাতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হলেও বিভাগীয় কর্মচারীদের ন্যায় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় এদের বিবেচনাধীন রাখা হয়নি। এমনকি ইতিমধ্যেই এঁদের ক্ষেত্রে অতীতে চালু 'রিক্রুটমেন্ট রুল' পরিবর্তন করে চালু করা হয়েছে 'এনগেজমেন্ট রুল' যা ক্যাজুয়াল কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এন এফ পি ই সহ ডাক কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবিকে নস্যাৎ করে এঁদের 'ডাক কর্মচারী' না বলে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ডাক সেবক' হিসাবে। আন্দোলন সংগ্রামে আঘাত হানার জন্য ১৯৯৫ সালে তথাকথিত নয়া স্বীকৃতিকরণ আইনের নামে জি ডি এস-দের বিভাগীয় কর্মচারী সংগঠনগুলির সদস্য/সদস্যা হিসাবে যুক্ত থাকার অধিকার একতরফাভাবে কেড়ে নিয়েছে তদানীন্তন ভারত সরকার, এমনকি জিডিএস-দের সংগঠনগুলির ন্যায্য স্বীকৃতি অনুমোদন করছে না ভারত সরকার, সরকারের অনুগামী সংগঠনকে জি ডি এস-রা কার্যত প্রত্যাখ্যান করায়।

সাফল্য ও শিক্ষা

লাগাতার ১৬ দিনের ঐক্যবদ্ধ, নিশ্ছিদ্র ধর্মঘটের মাধ্যমে মৌলিক দাবিগুলি অমিমাংসিত থাকলেও আর্থিক প্রশ্নে জি ডি এস- দের খানিকটা অগ্রগতি ঘটেছে। তবে সংবাদ মাধ্যমে মাননীয় টেলিকম মন্ত্রীর ঘোষণায় বিভ্রান্তির অবকাশ আছে যে, জি ডি এস-দের পারিশ্রমিক তিনগুণ হয়েছে। বাস্তবে তা নয়। কেন না ফরমুলা হচ্ছে ১ জানুয়ারি ২০১৬ কে ভিত্তি করে যার যার টি আর সি এ-র সাথে সে সময়কার ১২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা যুক্ত করে যে যোগফল হবে তাকে ২.৫৭ দিয়ে গুণ করে নয়া টি আর সিএ নির্ধারণ করা হবে। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির জি ডি এস-দের মাসিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাবে ৩০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা। ৩ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং ১/১/২০১৬ থেকে এক কিস্তিতে সমস্ত বকেয়া (এরিয়ার) মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও কিছুটা সহায়ক হবে জি ডি এস-দের।

কর্পোরেট মিডিয়া ও ডাক দপ্তরের বিএমএস-এর সংগঠন সমস্ত কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দিচ্ছে। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও দাবি তাই। যদিও সর্বস্তরের ডাক কর্মচারীদের সংগঠন ও তাদের অনুগামীরা এ বিষয়ে অবহিত যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেরই ফসল এই সাফল্য। এর ফলেই ৬ জুন ২০১৮ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়। এ রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের বিরোধী সরকার জি ডি এস-দের পক্ষ, উল্টে ধর্মঘটীরা কোথাও কোথাও শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হয়েছে।

কয়েক মাস আগেই মহারাষ্ট্রের কৃষকদের দৃষ্টান্তমূলক সংগ্রাম মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিল। তেমনভাবেই জি ডি এস-দের টানা ১৬ দিনের ঐতিহাসিক লাগাতার ধর্মঘট চূড়ান্ত শ্রমিক বিরোধী কেন্দ্রের মোদি সরকারকে বাধ্য করল বোঝাপড়ায় আসতে তাদের সাথে। আরও বাধ্য করল তাদের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলিকে স্বীকৃতি দিতে।

এই সফল ধর্মঘটের পিছনে অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল ধর্মঘটী সংগঠনগুলির এবং ধর্মঘটকারীদের দৃঢ় ঐক্য। যা কেন্দ্রীয় সরকারের গরম-নরম নানা কৌশলেও ভেঙে যায়নি। ধর্মঘট চলাকালীন বিভাগীয় সচিবের পক্ষ থেকে ধর্মঘটী ইউনিয়নগুলি ও ধর্মঘটিদের ব্যক্তিগত ভাবে আবেদন জানানো হয় ধর্মঘট থেকে সরে আসার জন্য। বলা হয় টেলিকম মন্ত্রী আলোচনায় বসবেন ধর্মঘটীদের সাথে, তবে তার প্রাক্শর্ত ধর্মঘট তুলে নিতে হবে। মাথা নোয়ায়নি দলমত নির্বিশেষে সমগ্র জি ডি এস কর্মচারীবৃন্দ। সাহসের পরাকাষ্ঠা তাঁরা দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তাঁদের কাজের সূত্রেই, জি ডি এস দের সাথে গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। এমনকি ব্যক্তিগত যোগাযোগ তৈরি হয়। এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সাধারণ মানুষকেও ধর্মঘটের প্রতি আকৃষ্ট করেছে এবং তাঁরা ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে। ধর্মঘট চলাকালীন কেন্দ্রীয় শাসকদলের গ্রামীণ এলাকার সমর্থকদেরও সরকার বিরোধী মনোভাব এর ফলে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টা কেন্দ্রীয় শাসক দলকে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত চাপে ফেলে দেয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের স্বৈরাচারী অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

গ্রামীণ ডাক সেবকদের টানা ১৬ দিনের শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা সাহসী ধর্মঘট দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে এক শিক্ষা। এই বার্তা সবত্র পৌঁছে গেছে যে যদি তিন লক্ষ জি ডি এস পারে তবে আমরা পারব না কেন? সর্বোপরি এই রাজ্যের আর্থিকভাবে ও অধিকারগত ভাবে চরম আক্রান্তরাজ্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, আমরাও নিশ্চয় এই ধর্মঘট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব যে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং সাহসী মানসিকতা থেকেই সাফল্য আসে। আমরাও আমাদের শাসককে বুঝিয়ে দেব যে - আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে আমরাও পারি। সেই দিন আসছে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পেনশনে কোপ

করবে। মোট অর্থ একটি পেনশন অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। যাতে করে এই অর্থকে পি এফ আর ডি এ/ কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী বিনিয়োগ করা যায়। মোট অর্থ (কর্মচারীর প্রদেয় + কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় + বিনিয়োগ ফেরৎ) অপ্রত্যাহারযোগ্য পেনশন অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে। চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের জন্য সরকার কোনো অর্থ প্রদান করবে না।

৬০ বছর বয়সে বা তার পরে স্তর-১ থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। সেক্ষেত্রে পেনশন অ্যাকাউন্টে সেই সময়ে জমা অর্থের ৪০ শতাংশ অ্যানুইটি হিসেবে (আই আর ডি এ নিয়ন্ত্রিত জীবন বীমা কর্পোরেশনের) বিনিয়োগ করতে হবে। বাকি অর্থ এককালীন কর্মচারীরা পাবেন। ৬০ বছর বয়সের আগে স্তর-১ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, গচ্ছিত অর্থের ৮০ শতাংশ অ্যানুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করতে হবে। স্তর-২ যা সম্পূর্ণভাবেই কর্মচারীদের ইচ্ছাধীন, সেখানে সরকার কোনো বিনিয়োগ করবে না। এই অর্থ অ্যানুইটি বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যাবে না। স্তর-২ এর অর্থ যে কোনো সময় কর্মচারীরা তুলতে পারবেন। এর ক্ষেত্রে আয়করের কোনো বিশেষ সুবিধা নেই।

ত্রিপুরায় নব নিযুক্ত বিজেপি সরকার এই নয়া প্রকল্প চালু করার যুক্তি হিসেবে আর্থিক দায়ভারের অজুহাত হাজির করেছে। সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে গত ১০ বছরে নাকি পেনশনের দায়ভার ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সরকারী কোষাগারের ওপর চাপ কমাতেই নাকি এই প্রকল্প হাজির করা হয়েছে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় সরকারের পেনশন ক্ষেত্রে দায়ভার কি আদৌ আগামী ৩০ বছরে কমবে? কারণ ১ জুলাই ২০১৮-র আগে যারা রাজ্যে প্রশাসনে কর্মরত তাদের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ পেনশন চালু থাকবে। পাশাপাশি নতুন পেনশন প্রকল্পের জন্য সরকারকে অর্থ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ আগামী বেশ কিছুদিন পেনশন খাতে সরকারের দায়ভার, কমার পরিবর্তে বাড়বে। সুতরাং এই যুক্তি একটি অসার যুক্তি। আসল কারণ হল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতোই রাজ্যের বিজেপি সরকারও নয়া উদারবাদী অর্থনীতি নির্দেশ অনুযায়ী চলতে চায়। যে অর্থনীতির মূল কথাই হল সরকার জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সরকারই নির্বাচনের আগে কর্মচারীদের কাছে কেন্দ্রীয় পে-কমিশন এনে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অর্থাৎ ক্ষমতায় বসার আগে একরকম, ক্ষমতায় এসে অন্যরূপ। □

সাম্য ও সম্প্রীতির কবি নজরুল

অশোক পাত্র

বাংলার বৃষস্কন্ধ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক অন্নদা শঙ্কর রায় বলেছিলেন 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল, আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে ভাগ হয় নিকো নজরুল'। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন দর্শন সম্পর্কে প্রয়াত অন্নদা শঙ্করের এই শাশ্বত উচ্চারণ কবিকে বাংলাদেশ তথা বাঙালীর চেতনায় যে গভীরে প্রোথিত করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকা গেয়েছেন 'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনায় নজরুল/যতই আসুক বিঘ্ন বিপদ হাওয়া হোক প্রতিকূল''। যথার্থ অর্থেই বাঙালী জাতির এই দুই কবি সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন। একজন বিশ্বকবি প্রকৃত বিশ্বদ্রষ্টা— বাংলা বাঙালী ভারত তথা সারা পৃথিবীর হৃদয় হরণকারী। আর একজন এই বাংলার রূপ রস বর্ণ গন্ধকে ভালোবেসে দেশীয় সমাজের যা কিছু পচা গলা শোষণ, বঞ্চনা, অসাম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, যাবতীয় অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিঝরা লেখনীকে অকৃপন ভাবে যেমন ব্যবহার করেছেন, অন্যদিকে রবীন্দ্র মানসে যে রোমান্টিসিজম্ সেই রোমান্টিকতায় ভেসে কাজী নজরুল ইসলাম গানে কবিতায় সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন- এখনও মাতিয়ে রেখেছেন। বৃটিশ শোষণ ও শাসনে পরাধীন ভারতে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্যে সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন লড়েছেন তেমনি অসাম্য, বৈষম্য শোষণ অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুধু লেখনীই ধারন করেননি, স্বয়ং পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচনে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছেন, জেল খেটেছেন, আবার সমগ্র পরাধীন জাতিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে লেখনীকে ব্যবহার করেছেন তরবারির মতো। তাই সত্যিই আপামর বাঙালীর চেতনায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অমর হয়ে আছেন, থাকবেন। তাঁর কালজয়ী প্রতিভা বিদ্রোহের অগ্নিস্ফূরণে পরাধীন জাতিকে যেমন স্বাধীনতার সংগ্রামে টেনে নামিয়েছিল, তেমনি স্বাধীনোত্তর কালে এতগুলো বছর ধরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দালাল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পরিচালিত তথাকথিত দেশীয় শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও তিনি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে বর্তমান এই অন্ধকার অবিনাশী সময়ে সারা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহে দলিত আদিবাসী তথাকথিত নীচু জাতি দরিদ্র-ক্ষেত মজুর- কৃষক-শ্রমিক-মহিলা বা নারী সমাজের ওপর গণতন্ত্রের নামে যে চরম শোষণ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে - বিশেষ করে সংখ্যা লঘু-মুসলিম-খৃস্টান ধর্মাবলম্বীসহ অপরাপর জনজাতির উপর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের শাসক

দলের দ্বারা, তার বিরুদ্ধে আমাদের জাগ্রত চেতনায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের পথ নির্দেশ করে দেন। এই অন্ধকার সময়ে চেতনার যে দ্রোহ সেই দ্রোহকাল বিচ্ছুরিত হয় নজরুলের কবিতায়, গানে—যা আমাদের এই অন্ধকারকে ছিন্ন করতে প্রয়োজনীয় আলোক বর্তিকার অন্যতম উপাদান।

নজরুলের অবিস্মরণীয় লেখনী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত পরাধীন জাতির মুক্তির উপায় যেমন অনুসন্ধান করেছে অবিরাম, তেমনি তা স্বাধীনোত্তরকালেও সমানভাবে আমাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি করে যাবতীয় শোষণ বঞ্চনা অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। যা পরাধীন ভারতে তিনি লিখেছিলেন, এখনো স্বাধীন ভারতে আমরা তা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করছি আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতায়।

বাংলার এই দামাল বিদ্রোহী কবির জন্ম হয় ইংরেজি ১৮৯৯ সালের ২৪ মে, বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া ব্লকের চুরুলিয়া গ্রামের এক সাধারণ দরিদ্র মুসলিম পরিবারে। ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল 'দুখু মিঞা'। পিতা কাজী ফকির আহমেদ—মাতা জাহদো খাতুন। জাহেদা ছিলেন ফকির আহমেদের দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাই-বোন। ছেলেদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়, কাজী ফকির আহমেদ স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং মাজারের খাদেম ছিলেন। 'দুখু মিঞার' বয়স যখন মাত্র নয় বৎসর তখন অকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে কবি ও কবির পরিবার চরম দারিদ্রের সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। তখন মাত্র দশ বছর বয়সে 'দুখু মিঞা স্থানীয় মসজিদ ও মাজারে তাঁর পিতার ছেড়ে যাওয়া কাজে জীবিকা নির্বাহের জন্য বাধ্য হয়ে যোগ দেন। মসজিদ, মাজার ও মক্তবে কাজ করার অনিবার্য বাধ্যবাধকতায় তাঁকে যেমন কোরান পাঠ শিখতে হয়, তেমনি ঐশ্লামিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও সম্যকভাবে অবহিত হতে হয়। আর অল্প বয়সে আয়ত্ত্ব করা ঐশ্লামিক সংস্কৃতির প্রভাব পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে তাঁর সাহিত্য চর্চাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। বাংলা ভাষায় উর্দু, ফারসি ও আরবি শব্দের অসংখ্য প্রয়োগ তাঁর অমর লেখনীতে বাংলা ভাষাকে (কাব্য, কবিতা, গান, প্রবন্ধ সাহিত্য) যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। যাই হোক তিনি মসজীদ-মাজার ও মক্তবের কাজে বেশী দিন ছিলেন না। কিন্তু ঐ সময়েই মক্তব থেকে তিনি নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষকতা করতে করতেই ঐ এলাকার গ্রামাঞ্চলে 'লেটোদের' দলে যোগ দেন। চেহারা ছিল সুন্দর, কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর সেজন্য 'লেটোর' দলে তাঁর সহজেই জায়গা হয়ে যায়।

বাংলারা রাঢ় অঞ্চলের নৃত্য-গীত - কবিতা - গান লোকসঙ্গীত প্রভৃতির ভ্রাম্যমান দলকেই লেটোর দল বলা হতো। ঐ লেটোর দলের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি গান - কবিতা - নাটক-প্রহসন ইত্যাদি মৌলিক রচনা করেন যার মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। আর এই কারণে তাঁকে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অধ্যয়ন করতে হয়, যা পরবর্তী কালের সাহিত্যকার্য, কাব্য রচনা ও ধর্ম্মীয় বিশেষ করে শ্যামা সঙ্গীত ও কীর্ত্তন রচনায় তাঁকে প্রভূত সাহায্য করে। ঐ সময় তিনি কিছুদিন

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রুখে দিন হাওর সদৃশ মোদি সরকারের শিক্ষানীতি

ঔৎসর্গ মিত্র

সেই ষোড়শ শতাব্দীতেই শিক্ষাবিদ স্যার ফ্রান্সিস বেকন বলে গেছিলেন, ''নলেজ ইজ পাওয়ার''- শিক্ষাই শক্তির উৎস। অর্থাৎ একটা জাতির শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে তার সার্বিক শিক্ষার মানের ওপর। আজকের এই একবিংশ শতককে বলা হচ্ছে তথ্য ও জ্ঞানের যুগ। সব উন্নত দেশের সরকাগুলিও তাই চেষ্টা করে যাচ্ছে কি করে তাদের দেশের মেধার উন্নয়ন ঘটানো যায় - বিজ্ঞানের মাধ্যমে, প্রযুক্তির মাধ্যমে কি করে এক একটা জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করা যায়। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, আমাদের দেশের সরকার ঠিক এর উল্টো পথ ধরে চলছে। প্রথম ইউ পি এ সরকারের আমল থেকে বামপন্থীদের নেতৃত্বে বহু লড়াই আন্দোলন করে দেশের নাগরিকেরা অবশেষে গত ইউ পি এ সরকারে কাছ থেকে যে 'শিক্ষার অধিকার আইন' ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, আজকে এন ডি এ সরকারের হাতে পড়ে তার করুণ অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যতই তাঁর প্রাক নির্বাচনী বক্তৃতাগুলিতে 'এন ডি এ জমানায় সরকার শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা নেবে, যাতে এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলি অচিরেই বিশ্বের তাবড় তাবড় ইউনিভার্সিটির সমকক্ষ হয়ে উঠবে' বলে গলাবাজি করে থাকুন না কেন, এই চার বছরে তাঁর সরকার শিক্ষায় উপকারের থেকে অপকারই বেশি করেছে।

এর আগের সরকারগুলি দেশের এগিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু আই আই টি, এন আই টি, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ বা বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র বানিয়েছিল শুধু নয় সেগুলি চালানোর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও তারা করতো। শুধু অর্থ বরাদ্দতেই শিক্ষার মান বাড়বে, এমনটা হতে পারে না, যদি না সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজের মতো করে চলার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য ঠিক করে দিতে পারে, তার 'ভিশন' পরিষ্কার করে দিতে পারে, কিন্তু চলতে দিতে হবে শিক্ষালয়গুলিকে তার নিজের মতো করে, কারণ দেশের প্রতিটি ঐতিহ্যশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে, ধারা আছে। শিক্ষার সাথে যুক্ত মানুষেরাই এর মর্ম বোঝেন, কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তির পক্ষে এটা বোঝা সম্ভবপর নয়। নরেন্দ্র মোদির আগে যত জন সরকার চালিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এটা জানতেন, বুঝতেন, আর বুঝতেন বলেই তাঁদের কেউই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ তো করেননিই, বরং তাঁরা দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক যে সংস্থাগুলি, যেমন ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন বা ইউ জি সি, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন বা এ আই সি টি ই বা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন বা এন সি টি ই-র মতো সংস্থাগুলির স্বাধিকার বাড়ানোরই চেষ্টা করে গেছেন - ব্যতিক্রম নরেন্দ্র মোদি।

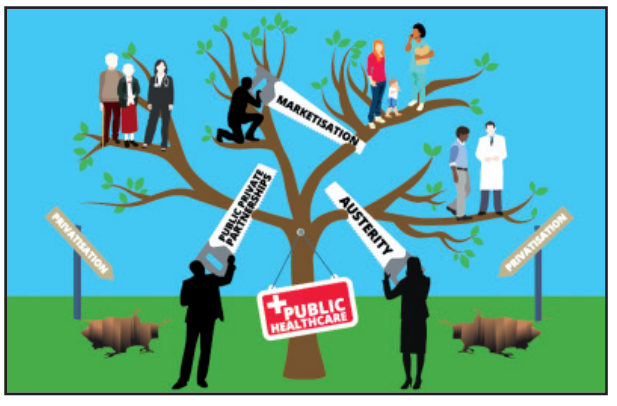

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইউ জি সি-র ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। ১৯৫৩ সাল থেকে পথ চলা শুরু করে আজ পর্যন্ত এই স্বাধীন সংস্থাটি নিরলস ভাবে কাজ করে এসেছে। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নানা রকম পরিকল্পনা, সেগুলোর ব্যয় বরাদ্দ করা ইত্যাদি ছিল এর কাজ। এমনকি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষায় বহু নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবকও ছিল এই সংস্থাটি।

যেহেতু দেশের বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষার্থীই আসে মূলতঃ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির থেকে, সেহেতু আগের শিক্ষামন্ত্রকগুলি এবং অবশ্যই ইউ জি সি— দুই পক্ষই ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে, যাতে বেশি বেশি করে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা হোস্টেলের সুযোগ কিম্বা স্কলারশিপ পেতে পারে। বর্তমান সরকার ঠিক এর উল্টো পথে হাঁটছে, বরং বলা যায়, সরকার শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এখন চতুর্মুখ আক্রমণে নেমেছে।

ক্ষমতায় এসেই মোদি সরকার যাত্রা শুরু করলো শিক্ষায় বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের মধ্যে দিয়ে। ২০১৫-১৬ বর্ষে ইউ জি সি-কে বরাদ্দ করা ৯,৩১৫ কোটি টাকাকে ২০১৬-১৭ বর্ষে এক ধাক্কায় নামিয়ে আনা হলো ৪,২৮৬ কোটি টাকায়, অর্থাৎ কমে গেল এক ধাক্কায় ৫৫ শতাংশ। শিক্ষা ক্ষেত্রে এতো বড়ো আক্রমণ এর আগের কোনও সরকারের কাছ থেকে আসেনি। এর ফলে ঐ বছর থেকে ইউ জি সি বাধ্য হয় তার অধীনের সমস্ত ইউনিভার্সিটিরই ব্যয় বরাদ্দে সাংঘাতিক ভাবে কাট-ছাঁট করতে। বাধ্য হয়ে বরাদ্দের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হলো সমস্ত নতুন বিষয়কে, শুধু মাত্র পুরনো বিষয়গুলিতেই বরাদ্দ থাকলো। আবার এর ফলে ইউনিভার্সিটিগুলোর অধীনে যে সমস্ত কলেজগুলো আছে, তারাও বাধ্য হলো তাদের ফি সাংঘাতিকভাবে বাড়িয়ে দিতে, কারণ এ ছাড়া তাদের কাছে আর কোনও পথ ছিল না প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের। ঐ বছরেই পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির অধীনের কলেজগুলির ফি গড়ে ১,১১০ শতাংশ এবং মুম্বাই আই আই টি-র ফি ৫৫ শতাংশ আর হোস্টেল চার্জ ৩০০ শতাংশ বেড়ে যায়। আবার কিছু ইউনিভার্সিটি তাদের ফি না বাড়িয়ে যে যে বিভাগে বাড়তি খরচ হয়, সেই সেই বিভাগে ছাত্র ভরতির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিল। ওই বছর গুজরাটের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, দিল্লীর জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির মতো ইউনিভার্সিটিগুলো পর্যন্ত এম ফিল এবং পি এইচ ডি কোর্সে আসন সংখ্যা ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফি বাড়ানোর ঠ্যালায় ৬,০০০-এরও বেশি আসন খালি থাকে বিভিন্ন আই আই টি, আই আই এম এবং এন আই টি-তে। ৭,০০০ এর বেশি আসন খালি পড়ে থাকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের ছেলে-মেয়েরা পড়া চালিয়ে যেতে পেরেছে অবশ্যই, কিন্তু চরম ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে মধ্যবিত্ত এবং প্রান্তিক ঘরের ছেলে-মেয়েরা, পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে অনেকে। গরীবের স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গিয়েছে আর এভাবেই হারিয়ে গিয়েছে বহু লড়াইয়ে পাওয়া 'শিক্ষার অধিকার আইন'।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের এক বড়ো অবদান ছিল স্কলারশিপ। এর মাধ্যমে সমাজের একেবারে পিছিয়ে পড়া অংশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চিন্তে তাদের পড়া চালিয়ে যেতে পারতো। এমনকি সাধারণ ভাবে উচ্চশিক্ষার জন্যে অপেক্ষাকৃত যেটুকু বেশি অর্থের চিন্তা করতে হতো, সেটাও এইসব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করতে হতো না এই স্কলারশিপ ব্যবস্থা থাকার জন্য। মোদির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার আঘাত হেনেছে ঠিক এইখানটাতেই। এম ফিল এবং পি এইচ ডি-তে গবেষণা চালাবার জন্যে সরকারের

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বাঁকুড়া

আলিপুরদুয়ার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উত্তর দিনাজপুর

মুর্শিদাবাদ

মালদা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচী

দাবিগুলির ব্যাখ্যা সম্বলিত লিফলেট পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনই ব্যাজও পৌঁছে দিয়েছেন। যে ৫টি দাবিকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচী, সেই দাবিগুলি হল— (১) বকেয়া মহার্ঘভাতা দ্রুত প্রদান, (২) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও তাকে কার্যকরী করা, (৩) প্রশাসনের সর্বস্তরে স্থায়ী শূন্যপদগুলিতে পি এস সি-র মাধ্যমে নিয়োগ, (৪) চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, (৫) রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বজায় রাখা এবং ধর্মঘটের অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা করা। এই ৫ দফা দাবি কর্মচারীদের নিজস্ব দাবি বলেই প্রচার পর্ব থেকেই দারুণ সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। এমনকি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত কোনো সমিতিরই সদস্য নন এমন কর্মচারীরাও নিজেরাই দাবি ব্যাজ চেয়ে নিচ্ছিলেন সংগঠকদের কাছ থেকে।

এই প্রচার চলাকালীন গত ১৮ জুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহার্ঘভাতা সম্পর্কিত একটি ঘোষণা করেন। যে ঘোষণায় কর্মচারীদের প্রায় ৭ মাস পরে, অর্থাৎ আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়। শুধু তাই নয়, রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ২০১৬ জুলাই মাস থেকে কর্মচারীরা যে ১০ শতাংশ ইন্টেরিম রিলিফ পাচ্ছেন, আগামী জানুয়ারি থেকে তা মহার্ঘভাতায় কনভার্টেড হবে। মহার্ঘভাতায় যার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণায় কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ হন। কারণ বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ ৪৯ শতাংশ। ১৮ শতাংশ জানুয়ারি থেকে পাওয়া মানেই বকেয়া থাকবে ৩১ শতাংশ। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকার আরও দু'দফায় মহার্ঘভাতা ঘোষণা করবে। ফলে আগামী জানুয়ারিতে বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তীত থাকবে। দ্বিতীয়ত, জানুয়ারি মাস থেকে অসংশোধিত বেতনক্রমের ওপর মহার্ঘভাতা ঘোষণা করার অর্থ হল, নভেম্বর ২০১৮ তে বেতন কমিশনের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলেও , তার সুপারিশ কার্যকরী হবে না। এই ছলনাপূর্ণ ঘোষণার ফলে কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যা ২৬-২৭ জুনের কর্মসূচীর গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮ জুনের ঘোষণার পরেই, ২০ জুনও গোটা রাজ্যে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ৫ দফা দাবিতে বিগত ২৬-২৭ জুন ২০১৮ তারিখে ব্যাজ পরিধান ও দুপুর ১.৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন দপ্তরে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিপালন করা হয়। ৫ দফা দাবির সমর্থনে এই কর্মসূচীটিকে সফল করার লক্ষ্যে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মী নেতৃত্ব সহ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতির কর্মী, নেতৃত্বরা জেলা অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ব্লক/ মহকুমায় এবং জেলা সদরের বিভিন্ন দপ্তরগুলিতে সফরের কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং সর্বত্রই কর্মচারীদের কাছে ৫ দফা দাবি সম্মিলিত ব্যাজ পৌছে দেওয়া হয় এবং কর্মচারীদের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ব্যাজ পরিধানের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগঠন তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচীটিকে সমস্ত কর্মচারীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে একটি লিফলেট জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত দপ্তরের কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। ২৬-২৭ তারিখ জেলার তিনটি মহকুমা ও জেলা সদরের দপ্তরে দপ্তরে প্রচার এবং বিক্ষোভ কর্মসূচী ও দাবি ব্যাজ পরিধান কর্মসূচী প্রতিপালন করা হয়। আলিপুর, ডায়মন্ডহারবার এবং বারুইপুরে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। জেলার কয়েকটি ব্লকেও এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে সাফল্যের সাথে। যে সমস্ত দপ্তরে পরিস্থিতি জনিত কারণে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালন করা যায়নি সেখানেও কর্মচারীরা দাবির সমর্থনে ব্যাজ পরিধান করেছেন। অসংগঠিত এবং বিরোধী সংগঠনের কয়েকজনও ব্যাজ পরিধান করেছেন যা উল্লেখের দাবি রাখে।

মালদা

গত ২৬-২৭ জুন, ২০১৮ পাঁচ দফা দাবিতে ব্যাজ পরিধান ও বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী মালদা জেলায় প্রতিপালিত হয়। ঐ দু'দিন জেলার ১৩টি ব্লক ১টি মহকুমা ও ৬টি অঞ্চলের মধ্যে ৯টি ব্লক ও মহকুমা সহ ৬টি জেলা সদর অঞ্চলে প্রায় ৬০০ জন সদস্যবন্ধু ব্যাজ পরিধান ও ৩৫০ জন সদস্যবন্ধু বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

নীচে, মহকুমা, ব্লক ও অঞ্চলের বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ কারীদের তথ্য দেওয়া হইল।

১) চাঁচল মহকুমা-৩৫ জন সদস্য, ২) হরিশচন্দ্রপুর ১ ও ২ নং ব্লকে মিলিত ভাবে ১০ জন সদস্য, ৩) চাঁচ ২ নং ব্লকে ৭ জন সদস্য, ৪) রতুয়া ২ নং ব্লকে ৪০ জন সদস্য, ৫) মানিকচক ব্লকে ১০ জন সদস্য, ৬) কালিয়াচক ২ নং ব্লকে ২৭ জন সদস্য ৭) কালিয়াচক ৩ নং ব্লকে ৭ জন সদস্য, ৮) পুরাতন মালদা ব্লকে ৪২ জন সদস্য ৯) বামোনগোলা ব্লকে ৫ জন সদস্য ১০) গাজোল ব্লকে ৩৫ জন সদস্য, জেলা সদরের ক) উত্তর অঞ্চল ২০ জন সদস্য খ) নেতাজী মারকেট অঞ্চল ২৩ জন সদস্য, গ) কালেক্টরেট অঞ্চলে ৬০ জন সদস্য ঘ) মধ্য অঞ্চলে ৩২ জন সদস্য, ঙ) হসপিটাল অঞ্চলে ৩৪ জন সদস্য, চ) দক্ষিণ অঞ্চলে ২৩ জন সদস্য।

জলপাইগুড়ি

২৬ ও ২৭ জুন ৫ দফা দাবিতে ব্যাজ পরিধান ও ১ ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী জলপাইগুড়ি জেলায় সাফল্যের সাথে প্রতিফলিত হয়। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে সমিতিগতভাবে দায়িত্ব বণ্টন করে জেলা থেকে টিম তৈরী করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে জেলার প্রায় সমস্ত দপ্তরে লিফলেট সহ প্রচার করা হয়েছে। হাতে লেখা পোস্টার ও ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে।

সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

দার্জিলিং

বর্ধমান

জলপাইগুড়ি

নদীয়া

পশ্চিম মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর

পুরুলিয়া

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

রুখে দিন হাওর সদৃশ মোদি সরকারে শিক্ষানীতি

পক্ষ থেকে মাসিক যে ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা দেওয়া হতো, তা কমিয়ে দেওয়া হলো দারুণ ভাবে, আটকে রাখা হলো দলিত এবং আদিবাসী ছাত্রদের জন্য আলাদা করে রাখা ১৩,১০৭ কোটি টাকা (১০,২৩৬ কোটি টাকা দলিতদের আর ২,৮৭১ কোটি টাকা আদিবাসীদের)। শুধু এখানেই থামেনি তারা, এমনকি দেশের যে সব জায়গায় দলিতদের ওপর কিম্বা ডঃ বি আর আম্বেদকরের দর্শন আর সামাজিক ন্যায় বিচারের ওপর গবেষণা হয়, তার সব কয়টিতেই অনুদান কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেকে 'দলিত বান্ধব' বলে প্রচার করে থাকে। আরও অনেকগুলো ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও বিজেপি-র ভন্ডামির এ এক বড়ো নিদর্শন।

সরকারের এই ভণ্ডামি স্বভাবতই ছাত্র সমাজ, বিশেষ করে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলো থেকে আসা ছাত্ররা মুখ বুজে মেনে নেয়নি। তারা সরকারের এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল, কিন্তু সেসব আন্দোলন হয় সরকারের পোষা পুলিশ অথবা সরকারি দলের পোষা ছাত্র সংগঠন এ বি ভি পি-র ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী নির্মম ভাবে দমন করেছে। রোহিত ভেমুলা, রিচা সিং বা গুরমেহর কৌর-কে মনে পড়ে? এরা সবাই ঐ সময়ে আন্দোলনে নামা ছাত্র-ছাত্রী এবং বিজেপি-র ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর শিকার। ফি কমানোর দাবিতে গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের এই সব আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখানো বা তাদের বক্তব্য শোনার মতো মানবিকতা দেখানো দূরে থাক, সরকার পক্ষ সে সময়ে এইসব গুণ্ডামিকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষ ভাবে মদতই যুগিয়েছে। কোনও সভ্য সমাজে এ ঘটনা মানা যায় না। অরুণ জেটলি সহ বিজেপি-র নানা ছোট-বড়-মেজো-মাঝারি নেতাদের মুখ থেকে সে সময়ে এমন সব কথা বেরিয়ে আসতো, যেগুলো আদতে ছিল সভ্যতারই পরিপন্থী। আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি বরাবরই যে জাত-পাতের রাজনীতিতে অভ্যস্ত, নিম্ন বর্ণের প্রতি উচ্চ বর্ণের ঘৃণা যে জাত পাতের রাজনীতির ভিত্তি , সেই ঘৃণাই ফুটে উঠত সেই সময়ে এইসব নেতাদের কথায়। জাত-পাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া বিজেপি-র পুরনো এবং লুকোনো এজেন্ডা আর এখন লোক সভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়ে সেই এজেন্ডারই বাস্তব রূপ দিতে চাইছে তারা। শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি তাদের আক্রমণের তৃতীয় মুখ। ভারতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন ৩৫টা গবেষণা কেন্দ্র ছিল, যেখানে দেশের পিছিয়ে পড়া জাতি, আদিবাসী, মূলবাসী, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক মানুষদের কি করে মূলস্রোতে নিয়ে আসা যায়, সে সম্পর্কে স্থানীয় ভাবে গবেষণা করে সরকারকে পথ দেখানো হতো। গত চার বছরে এই সংখ্যা বাড়েনি আর শুধু নয়, এগুলির জন্য ব্যয় বরাদ্দেও ব্যাপক কাট-ছাঁট হয়েছে। ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ পিছিয়ে পড়া মানুষ আজ ঘোর অন্ধকারে। এইসব পরিবার থেকে উঠে আসা ছাত্রদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে সরকারের মানসিকতার জন্য, অথচ এরাই দেশের সংখ্যাগুরু। এই ব্যাপক অংশের মানুষের উন্নতি ছাড়া 'আচ্ছে দিন' আনা অসম্ভব, অথচ নরেন্দ্র মোদি যেখানেই বক্তৃতা দেন, সেখানেই গলার শির ফুলিয়ে 'আচ্ছে দিন' এর জয়গান করে যান। দেশের ভবিষ্যৎ হিসেবে চিহ্নিত লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সর্বনাশ করে 'আচ্ছে দিন'এর বড়াই করার মতো বড়ো অনৃতভাষণ আর হতে পারে না, আর সেটাই হচ্ছে নিয়মিত ভাবে।

শুধু এখানেই শেষ নয়, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করা এবং ঐ সব সংস্থায় শূন্য পদগুলি পূরণ না করা এখন এন ডি এ সরকারের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র সরকারী ঔদাসিন্যে এইসব সংস্থায় প্রায় ৪৩ শতাংশ পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আগে ইউ জি সি এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বাইরে থেকে অধ্যাপক ডেকে এনে ফ্যাকাল্টি ভরাটের চেষ্টা করতো। এক সময়ে প্রায় ২৬৫ জন অধ্যাপক বাইরে থেকে এদেশে এসে পড়াচ্ছেন, এমনও হয়েছে। কিন্তু সরকার এখন এ ব্যাপারে একেবারে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। ইউ জি সি-র 'ফ্যাকাল্টি রিচার্জ' প্রকল্পে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে তারা বাধ্য করেছে প্রকল্প বাতিল করতে, ফলে দুর্দশা বেড়েছে বৈ কমেনি। কিন্তু সরকার নির্বিকার। এখন আবার সরকার চেষ্টা করছে গোটা ইউ জি সি-টাকেই তুলে দিতে। এই বাদল অধিবেশনে এ সংক্রান্ত বিল আনতে চলেছে তারা। ইউ জি সি-কে ভেঙে দিয়ে একাধিক সংস্থা তৈরি হবে যদি এই বিল পাশ হয়ে যায় এবং সে ক্ষেত্রে শিক্ষা জগতে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে।

এই মুহূর্তে দেশের শিক্ষায় ইউ জি সি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে - প্রথমত, কোনও ইউনিভার্সিটি বা কলেজে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দরকার, তার একটা হিসেব করে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা, অর্থাৎ কোন স্তরে কি ধরনের শিক্ষাক্রম চালু করা উচিত, তার সিলেবাস কি হবে, কোন কোন বিষয় পাঠ্যক্রমের মধ্যে আসা উচিত ইত্যাদি নির্ধারণ করা। এ ব্যাপারে তাদের নিরন্তর গবেষণা চলে। যদি সরকারের এই বিল পাশ হয়ে যায়, তাহলে ইউজিসি একেবারেই উঠে যাবে। এরপর থেকে কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে আর্থিক বরাদ্দের ব্যাপারটা দেখবে সরকারের মানবোন্নয়ন দপ্তর এবং পাঠ্যক্রম-শিক্ষাক্রম ইত্যাদি ব্যাপারগুলো দেখার জন্যে একটা নতুন কমিশন বা আয়োগ তৈরি হবে, যার নাম হবে 'হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া' বা এইচ ই সি আই। এটা যদি হতে পারে, তাহলে শিক্ষার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ হবে অর্থাৎ এতদিন যা ছিল নিরপেক্ষ, এবার থেকে সেটা হবে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক' এবং এটি হচ্ছে শিক্ষার ওপর মোদি সরকারের আক্রমণের চতুর্থ ও সবচেয়ে মারাত্মক দিক!

প্রস্তাব অনুযায়ী এইচ ই সি আই-তে একজন চেয়ার পার্সন ও একজন ভাইস-চেয়ারপার্সন থাকবেন, যাঁদের মনোনীত করবে ক্যাবিনেট সচিব এবং মানোবন্নয়ন দপ্তরের সচিব। এ ছাড়াও কমিশনের সদস্য হিসেবে থাকবেন আরও বারোজন, যাঁদের মধ্যে অবশ্যই থাকবেন সরকারে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ, দুইজন কর্মরত ভাইস-চ্যান্সেলর, একজন শিল্পপতি ও একজন অধ্যাপক। এঁদের সবাইকেই মনোনীত করবে সরকার নিজে। এতেও যথেষ্ট হবে না মনে করে সরকার আবার এদের ওপর এক 'উপদেষ্টামণ্ডলী' বসিয়ে দেবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন মানবোন্নয়ন মন্ত্রী নিজে! সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বিল পাশ হলে কারা থাকবে দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম তৈরির দায়িত্বে এবং এটাও বোঝা যাচ্ছে তারা কী ধরনের শিক্ষাক্রম তৈরি করবে। এমনিতেই শেষের দিকে ইউ জি সি কিছুটা হলেও তার স্বাধীন সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষমতা ছিল ইউ জি সি-র ফতোয়াকে অস্বীকার করার। সে সব ক্ষেত্রে খুব বেশি হলে ইউ জি সি তাদের অনুদান বন্ধ করে দিতে পারতো, কিন্তু নতুন অবস্থায় এমন হলে কমিশনের ক্ষমতা থাকবে সেই প্রতিষ্ঠানটিকেই বন্ধ করে দেওয়ার। অর্থাৎ সরকার চাইছে শিক্ষা বাস্তব সম্মত নয়, হবে তার 'মতাদর্শ' অনুযায়ী এবং সেটাও হবে মুষ্টিমেয়র জন্যে। এই কারণেই বিলে 'সেল্‌ফ ফিনান্সড' অটোনমাস কলেজ অর্থাৎ স্বয়ংশাসিত কিছু কলেজের কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেদের রসদ নিজেরাই সংগ্রহ করতে পারবে তাদের ইচ্ছা মতো এবং সে ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রর থাকবে না।

এমনিতেই মোদির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদেই যোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক, আর এস এস-এর লোকদের বসিয়ে দিচ্ছে নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা ছাড়াই। ইউ জি সি-কেও তারা ছাড় দিয়েছিল এমনটা নয়। কিন্তু যদি এই বিল পাশ হয়, তাহলে তারা ভবিষ্যতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে জাতির মেরুদণ্ড তৈরির এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে। আজ তথাকথিত 'হিন্দুত্ব' নিয়ে যে মাতামাতি চলছে গোটা দেশ জুড়ে আর এস এস-এর মদতে, তা এরপর থেকে নির্বিবাদে ঢুকে পড়বে শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমে। ভারতবর্ষের মতো বহুত্ববাদী এক দেশে এ এক মারাত্মক পদক্ষেপ। এই একটি পদক্ষেপই দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য বিভাজনই এই সরকারের আরাধ্য 'নয়া উদারবাদী অর্থনীতি'র মূল প্রতিপাদ্য, যাতে মানুষের ঐক্য কিছুতে না গড়ে উঠতে পারে এবং সেই অনৈক্যের ফাঁক দিয়ে পুঁজিপতিরা তাদের অবাধ মুনাফার পথ করে নিতে পারে। এই শিক্ষা সংক্রান্ত বিলের ছত্রে ছত্রে রয়েছে সেই চক্রান্তের ছবি। একে সর্বশক্তি দিয়েই তাই রুখে দেওয়ার দরকার নিজের স্বার্থে... ভবিষ্যতের স্বার্থে... দেশের স্বার্থে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

কবি নজরুল

যাত্রাপালাতেও অংশগ্রহণ করেন। ফলে লেটোর দল, কবিগানের আসর, যাত্রাপালায় যোগদান এসব কিছুই তাঁর পরবর্তী সাহিত্য - সঙ্গীত - কাব্যজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐ সময় কবির জীবন ছিল ভবঘুরের।

১৯১০ সালে নজরুল লেটোর দল ছেড়ে রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরবর্তী কালে মাথরুন ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের সান্নিধ্যে আসেন। যা পরবর্তী কালে তাঁর কবি জীবনকে দারুণ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। স্কুল জীবনে তাঁর সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে তাঁকে স্কুল ত্যাগ করে আসানসোলে প্রথমে একজন খৃষ্টান রেলওয়ে গার্ডের খানসামা এবং সবেশেষে আসানসোলে চা-রুটির দোকানে কাজ করতে বাধ্য হন। এইখানে কাজ করার সময় আসানসোলের দারগো রফিকা উল্লাহের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। দোকানে কাজের অবসরে কবি যেসব কবিতা ও ছড়া রচনা করতেন তা দেখে দারোগা সাহেব বুঝতে পারেন ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা আছে। তিনিই শেষ পর্যন্ত কবিকে ১৯১৪ সালে ময়মন সিংহ জেলার দরিরাম পুর স্কুলে (ত্রিশালে) সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে দেন কিন্তু এক বছর বাদে তিনি সেখান থেকে পুনরায় ১৯১৫ সালে রানীগঞ্জের সিয়ারশোল রাজ স্কুলে ফিরে যান এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণী থেকে পড়াশোনা শুরু করে ১৯১৭ সালের শেষে এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রি-টেস্ট পরীক্ষা না দিয়ে দারিদ্রের কারণে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ চলা অবস্থায় পরাধীন ভারতে বৃটিশ সৈন্য দলে যোগ দেন। সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষে তিনি করাচী সেনা নিবাসে সৈনিক হিসাবে থাকতে শুরু করেন। ঐ সময় বাঙালীদের নিয়ে বাঙালী পল্টন বা ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হলে সেই রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিক থেকে মাস্টার হাবিলদার হয়েছিলেন। ওখানে থাকা অবস্থায় তিনি ঐ রেজিমেন্টের পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। আগেই বলা হয়েছে শিক্ষকতার কারণে উর্দ্দু ও আরবি ভাষায় তাঁর ভালো ব্যুৎপত্তি ছিল। বাংলা মাধ্যমে হাই স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করায় তাঁর বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাতেও ভালো বুৎপত্তি ছিল। এই সমস্ত ভাষাকেই তিনি বাংলাভাষায় কাব্য ও সাহিত্য রচনায় খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করেছেন যাকে এক কথায় বলা যায় অভাবনীয়। তিনি করাচী সেনা নিবাসে থাকা অবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় ৪৯ নং বাঙালী রেজিমেন্টের মেসোপটেমিয়াতে যুদ্ধ করতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে আকস্মিকভাবে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হলে প্রায় আড়াই বছর পর নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে মুসলিম সাহিত্য সমিতির ঘরে আশ্রয় নেন। ওখানেই তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রবাদ প্রতিম কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আহমদের সঙ্গে আলাপ হয়। বলা বাহুল্য মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর। স্বাভাবিক ভাবেই এই সাম্যবাদী নেতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন, মূলতঃ এই মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিস থেকেই নজরুলের সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবনের শুরু হয়। প্রথম দিকে মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হলে তিনি সাহিত্যিক সাংবাদিক মহল ও বহু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এখানে থাকা অবস্থায় তিনি কলকাতার বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে নজরুল শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার আগে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে ভারতে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সান্ধ্য নবযুগ নামে পত্রিকা প্রকাশিত হলে 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। যার ফলে ঐ পত্রিকার জামানেত বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজরোষে পড়েন। এ সময়ে তিনি মুজফ্ফর আহমদের সান্নিধ্যে বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান করে তৎকালীন পরাধীন ভারতে দেশ তথা বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন।

১৯২১ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। মুজফ্ফর আহমেদের ন্যায় তিনি মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে আর একজন কর্মকর্তা ও সমিতির গ্রন্থ প্রকাশক আলী আকবর খানের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁর সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে আসেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে নজরুল জায়া প্রমীলা দেবীর সঙ্গে প্রথমে পরিচয় পরে প্রেম এবং শেষে তাঁরা পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

তাঁদের চারটি সন্তান তার মধ্যে কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধের শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বুৎপত্তি ছিল। বড় ছেলে কৃষ্ণ মহম্মদের অকালে প্রয়ান ঘটে। ঐ সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনে সারা দেশে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। নজরুল ১৯২১ সালে কুমিল্লাতে অসহযোগ আন্দোলনে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়েন- নিজেই সুর দিয়ে গান রচনা করে ২১শে নভেম্বর তারিখে সারা ভারত ব্যাপী হরতাল উপলক্ষে মিছিল করে শহরে ঘোরার সময় গান করেন 'ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও ফিরে চাও ওগো পুরবাসী'। তার আগে আরো কয়েকটি গান ও কবিতা রচনা করেন যাতে প্রবল বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের আবহে, বিজলী পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সত্যিকারের 'বিদ্রোহী কবি' হিসাবে নজরুল বাঙালী জনচিত্ত জয় করে নেন। বঙ্গবাসী তাঁকে সাদরে বরণ করে বাঙালী মননে গ্রহণ করে। অগ্নিবীনার সুরে এই কবিতায় নজরুল বলে উঠলেন 'বল বীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি ঐ শিখর হিমাদ্রির ..... আরো লিখলেন' এক হাতে মম বিষের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য ... লিখলেন 'মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত

আমি সেইদিন হবো শান্ত।/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল/ আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,/ যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ/ভীম রণভূমে রণিবে না/বিদ্রোহী রণক্লান্ত /আমি সেই দিন হবো শান্ত।।/আমি চির বিদ্রোহী বীর-/ বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।"

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১২ আগস্ট নজরুল ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর কিছু আগে থেকেই ধীরে ধীরে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশের জন্য নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে পাঠালে বিশ্ব কবি লেখেন, কাজী নজরুল ইসলাম কল্যানীয়েষু, ''আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু/ দুর্দ্দিনের এই দুর্গ শিরে / উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।"

যতদিন এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ততদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় সবার উপরে কবির এই আশীর্বাদ লেখা থাকতো। এই পত্রিকাতেই ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর নজরুলের কবিতা ''আনন্দময়ীর আগমনে" প্রকাশিত হলে নভেম্বর পত্রিকার এই সংখ্যাটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ঐ বছরের ২৩ নভেম্বর তাঁর যুগবানী প্রবন্ধ গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ঐ দিনই তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করার পরে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি বিচারে নজরুলের একবছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁকে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখার সময় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। এতে নজরুল বিশেষভাবে উল্লসিত হয়ে জেলে বসেই 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" কবিতাটি রচনা করেন। বন্দীদের উপর নানা অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল আপসহীন মনোভাব নিয়ে হুগলী জেলে দীর্ঘ দিন অনশন করলে বিশ্বকবি তাঁকে অনশনভঙ্গের অনুরোধ জানান।

তাঁর রচিত 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ভেঙে ফেল কররে লোপাট ..

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবীদের দারুণ অনুপ্রানিত করেছিল। ছাত্র যুব তরুণদের উদ্দীপিত করেছিল 'চলরে চল উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল সঙ্গীতটি।

তিনি ছিলেন সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে তাই তিনি ফরিয়াদ কবিতায় লিখেছেন 'জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয় সন্তানসম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।' লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধে অবমানিতের পক্ষে বারাঙ্গনা কবিতায় কবি লিখছেন, ''কে বলে তোমায় বারাঙ্গনা, মা কে দেয় থুতু ও গায়ে/হয়তো তোমায় জন্ম দিয়াছে সীতা সম সতীমায়ে।"

সাম্যবাদী কবিতায় কবি লিখলেন ''বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যানকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

''সব্যসাচী" কবিতায়

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লিখলেন '' মেনে টিক্‌টিকি হাঁচি দাড়ি প্রায় মরিয়াছি/এবার একটা দাও কিছু

সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচী

কর্মসূচীর দিন সকাল থেকেই ব্যাজ পরানো হয়েছে। ২৬ জুন, ২০১৮ জেলার ১৩টি জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে এবং মোট ৪৬৭ জন অংশগ্রহণ করেন। সর্বত্র জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ২৭ জুন, ২০১৮ জেলার ৫টি জায়গায় ৩৩৯ জন অংশগ্রহণ করেন। এই দিন জেলা শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা শাসকের দপ্তরে এবং মালবাজারে কেন্দ্রীয়ভাবে মহকুমা দপ্তরে যথাক্রমে ১৯৭ জন ও ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জেলার আরও ৩টি দপ্তরে পৃথকভাবে কর্মসূচী হয়েছে। এই কর্মসূচীতে পেনশনারদেরও এক অংশ যুক্ত হয়েছেন। এই কর্মসূচী নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা গেছে। □

দক্ষিণ দিনাজপুর

এই জেলার ৭টি ব্লকেই অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। □

বাঁকুড়া

জেলা শাসকের দপ্তর, দুটি মহকুমা শাসকের দপ্তরসহ আরো তিনটি স্থানে এই কর্মসূচীতে মোট ২৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনের কর্মসূচীতে বড় অংশের কর্মচারী ব্যাজ পরেছিলেন। বিরোধীদেরও কেউ কেউ ব্যাজ নিয়েছিলেন।□

মুর্শিদাবাদ

এই জেলায় জেলা শাসকের দপ্তর, তিনটি মহকুমা শাসকের দপ্তর এবং ২০টি ব্লকে কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে।

নদীয়া

দু'দিন ব্যাপী ব্যাজ পরিধান ও দুপুরে বিক্ষোভ কর্মসূচী ব্লক, মহকুমা ও জেলা সদর মিলিয়ে ১৪টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েতে সর্বমোট ৬ শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ২৫০০ জন কর্মচারী ব্যাজ পরিধান করেছিলেন। □

আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার জেলায় এই কর্মসূচী জেলা সদরের পাশাপাশি চারটি ব্লকেই সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়। জেলা শাসকের দপ্তর, এনএইচ ডিভিশন, কামাখ্যাগুড়ি, কালচিনি, মাদারিহাট, ডালকোটা ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন দপ্তরে বিক্ষোভ সভায় প্রায় ২০০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

পুরুলিয়া

দু'দিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে কালেক্টরেট, রাঁচিরোড (স্বাস্থ্য ভবন), নড়িহা শিল্প ভবন, সদর হাসপাতাল, রাঘবপুর মাইনস দপ্তর, ঝালসা মহকুমা শাসকের দপ্তর, রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের দপ্তর, ঝালদা-১, ঝালদা-২, বাগমুন্ডি, আড়ষা, পুরুলিয়া-১, পুরুলিয়া-২, হড়া ইত্যাদি জায়গায় ৫ শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জেলা সদরের পাঁচটি অঞ্চল, দুটি মহকুমা শাসকের দপ্তর ও ৮টি ব্লকে কর্মসূচী সফলভাবে প্রতিপালিত হয়েছে। □

উত্তর দিনাজপুর

এই জেলার ১১টি জায়গায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচী হয়েছে। ২ শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

পূর্বাঞ্চল

এই অঞ্চলের অভ্যন্তরে সমস্ত দপ্তরে প্রতিপালিত হয়েছে। এছাড়াও অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ২৬ জুন বাণিজ্য কর দপ্তরের কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দেবশঙ্কর সিনহা, চন্দন সেন রায়, সুমন কান্তি নাগ, অরুপ চন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই বিক্ষোভ সভায় আবৃত্তি পরিবেশন করেন মায়া মুখার্জী ও লক্ষ্মী দাস। দেড়শতাধিক কর্মচারী এই বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন। □

দক্ষিণাঞ্চল

২৬ এবং ২৭ জুন দপ্তরে দপ্তরে অবস্থান কর্মসূচী কলকাতা দক্ষিণাঞ্চলে ভবানীভবন, গোপালনগর সার্ভে বিল্ডিং, বিজিপ্রেস, লোকসভা আয়োগ (পিএসসি), গড়িয়াহাট আইটিআই এক্সসাইজ অফিস, প্রেস এ্যান্ড ফর্মস, এগ্রি ইরিগেশন অফিস এবং বেলতলা মোটর ভেহিক্যালসে অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনের এই কর্মসূচীতে অঞ্চলের নেতৃত্ব ছাড়াও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক মানস দাস, প্রাক্তন সভাপতি অশোক পাত্র, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশীষ মিত্র, অমিত ব্যানার্জী এবং অঞ্চল সম্পাদক সুব্রত গুহ বিভিন্ন সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনের এই কর্মসূচীতে ৪৫০ জন সদস্য বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন। □

লবণহ্রদ অঞ্চল

২৬-২৭ জুন ২০১৮ সারা দিন ব্যাপী ব্যাজ পরিধান ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী লবণহ্রদ অঞ্চলে মোট ১২টি বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলিতে স্লোগান, বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়েছে। সাধারণ কর্মচারী আনুমানিক ৪৫০ জন এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রায় ৩ হাজার ব্যাজ কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের একাংশ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। □

মধ্যাঞ্চল

মধ্যাঞ্চলের উদ্যোগে দাবী ব্যাজ পরিধান ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতি পালিত হয়েছে। ঐ দুদিনই অঞ্চলের কর্মী নেতৃত্ব সারাদিন দাবি ব্যাজ পরিধান করেছিলেন। ২৬ তারিখ খাদ্যভবন প্রাঙ্গনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীতে ১২৫ জনেরও বেশি কর্মী-সদস্য উপস্থিত হন। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও বডি-পোস্টার পরিধান করে কর্মী ও কর্মচারী এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। ২৬ তারিখ এই কর্মসূচী পরিচালনা করেন অঞ্চল কমিটির সভাপতি মৌলিনাথ মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য ও অন্যতম সহ সম্পাদক মানস দাস। অবস্থানে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মহুয়া সাহা ও দীপা প্রামানিক।

মধ্যাঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরেও বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন মধ্যাঞ্চলের সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত। ২৭ জুন, বিক্ষোভ কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিনে খাদ্য ভবন প্রাঙ্গনের জমায়েতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক দেবব্রত রায় ও অঞ্চল সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত। □

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

কবি নজরুল

হাতে একবার মরে বাঁচি। ধূমকেতু, অগ্নিবীনা, বিষের বাঁশি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে বিদ্রোহের বানী অন্যদিকে ছিল তার রোমান্টিকতায় ভরা কবি মন। অগ্নিবীনা হাতে যাঁর প্রবেশ তাঁর লেখনীতেই এল রোমান্সের গান" মোর প্রিয়া হবে এসো রানী" দেবো খোঁপায় তারার ফুল, কণ্ঠে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল"। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতায় লিখলেন ''হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।" হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মৈত্রী তৈরীর জন্য গান বাঁধলেন ''মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান ...."

তৎকালীন মেকী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যঙ্গ করে 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় লিখলেন 'ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ চায় শুধু ভাত একটু নুন, বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।

আরো অসংখ্য কবিতায় গানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

কবি স্বয়ং ছিলেন সাম্যবাদের মূর্ত্ত প্রতীক। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন শোষণমুক্ত সমাজের, করেছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বাংলা অনুবাদ ---

''জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত/জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত/ যত অত্যাচরী আজি বজ্রহান/ আছে নিপীড়িত জনগন মথিত বানী/নব জন্ম লভি অভিনব ধরনী/ঐ ঐ আগত।"

''ভেঙে দৈত্য কারা আয় সর্বহারা/ কেহ রহিবে না আর পর পদ আনত।"

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিভেদ তৈরি করে শাসন আর শোষনের জন্য ভারতবর্ষে যে ঘৃন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল। কবি ইসলামী চেতনায় সুশিক্ষিত হলেও ছিলেন ঘৃন্য মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা- যার প্রতিফলন তাঁর নিজের জীবনেই পড়েছে।

অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি খালি লেখনী ধারণ বা বানী বিতরণ করেন নি। বিবাহ করেছিলেন হিন্দু রমনীকে। ছেলেদের নাম রেখেছিলেন হিন্দু পুরাণ আর মুসলিম সংস্কৃতির মেলবন্ধনে। বড় ছেলে কৃষ্ণ-মহম্মদ তারপর কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ, অরিন্দম কাজী প্রভৃতি। সাম্রাজ্যবাদী শোষনে জর্জরিত পরাধীন দেশের শৃঙ্খল মোচনে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, জাগিয়ে তুলে ছিলেন দেশের মানুষকে প্রকৃত অর্থেই তাঁর একহাতে ছিল 'বিষের বাঁশরী আর হাতে রণ তুর্য।' শোষিত অবমানিত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত অবদমিতর পাশে দাঁড়িয়ে অবিরাম যুদ্ধে তিনি ছিলেন অক্লান্ত।

চির বিদ্রোহী এই কবি ১৯৪২ সালে আকাশবানীতে সঙ্গীত পরিবেশন কালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ঐ বছরের শেষের দিকে তিনি সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপে জানার পর, তাঁকে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে নিউরো-সার্জারি করা সম্ভব হয়।

তাঁর স্ত্রী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় তাঁদের দুজনকে ১৯৫২ সালে রাঁচির মানসিক হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ১৯৫৩ সালে ইউরোপের লন্ডনে ও ভিয়েনায় নিয়ে গিয়ে জানা যায় তাঁর পিক্স্ ডিজিজ হয়েছে যা দুরারোগ্য। দেশে ফেরার পর তাঁকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য জগত্তারণী পদকে ভূষিত করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ঐ দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে ১৯৭২ সালে কবিকে সে দেশে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, লিট্ দেয়। বাংলাদেশের সরকার সে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান অমর একুশে পদকে তাঁকে সম্মানিত করে এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে। মূক অবস্থাতেই ১৯৭৬ সালে কবির প্রয়ান ঘটে। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ করা হয়।

বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত হয়ে সেখানেই চিরবিদায় শায়িত আছেন। তাঁর রচিত 'অভিশাপ' কবিতায় কবি লিখেছেন-

'যেদিন আমি হারিয়ে যাব বুঝবে সেদিন অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে—

বুঝবে সেদিন বুঝবে!

কবির কথা অনুযায়ী সত্যিই আমরা চিরকাল তাঁকে খুঁজতে থাকবো তাঁর আরব্ধ শোষনমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রামের ময়দানে। □

রক্তদান কর্মসূচী

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

আমাদের প্রিয় সমিতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতি বছরের মতো এ বছরও অরণ্য সপ্তাহের প্রাক্কালে গত ১৩ জুলাই ২০১৮ কলকাতায় অরণ্য ভবনে কেন্দ্রীয়ভাবে রক্তদান কর্মসূচী পালন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, বীরভূম ও কলকাতা জেলা যুক্ত হয়েছিল। প্রায় দুই শতাধিক কর্মচারী নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই মহতী অনুষ্ঠান পালিত হয়। ২ জন মহিলাসহ মোট ৫০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমল চক্রবর্তী। উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশিস ভট্টাচার্য্য। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক উল্লাস নাথ। □

বর্ধমান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বর্ধমান জেলা শাখার আহ্বানে ২৯ জুন ২০১৮ রক্তদান কর্মসূচী কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ জন মহিলা সহ ৮৬ জন রক্তদান করেছে। রক্তদান একটি সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী সভার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। উদ্বোধন করেন বর্ধমান জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক রনজিৎ দত্ত। উদ্বোধনী সভায় মোট ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী

ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন থেকে অধিকারগত, আর্থিক এবং সর্ব সাধারণের ৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে ১২ জুন গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় প্রতিবাদ দিবস এর কর্মসূচী প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে জ্বলন্ত ৩ দফা দাবিকে যুক্ত করে মোট ৮ দফা দাবির সমর্থনে এই প্রতিবাদ দিবস এর কর্মসূচী কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে। দাবি প্রস্তাব পেশা করে তিনি আরও বলেন, দেশ ও রাজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে দুটি সরকার রয়েছে তারা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চরম আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের বিলগ্নীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সর্বোপরি গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক পরিবেশের ওপর প্রতিনিয়ত আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। দেশ ও রাজ্যের মানুষের ওপর ঘটে চলা এই চতুর্মুখী আক্রমণের বিরুদ্ধেও আমাদের প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সহ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত সকল স্তরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই আমাদের দাবি বকেয়া মহার্ঘভাতাকে যুক্ত করেই ষষ্ঠ বেতন কমিশন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

দাবি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিন্হা বলেন, বিগত ৪ বছর ধরে দেশের সরকার নয়া উদার আর্থিক নীতিকে বেপরোয়াভাবে কার্যকর করতে উদ্যত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। পার্লামেন্ট অভিযান সংগঠিত হয়েছে। দেশের শ্রমজীবী মানুষ ঝান্ডার রং ব্যতিরেকে আন্দোলন সংগ্রামে সংগঠিত হচ্ছে দেখে, মানুষের ঐক্যকে ভাঙার জন্য ধর্মের ভিত্তিতে, জাত পাতের ভিত্তিতে বিভাজনের চক্রান্ত করছে আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকার, ধর্মীয় মেরুকরণের প্রয়াস চলছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই এর অংশে হিসাবে একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কর্মসংস্থান এর দাবি সহ শ্রমজীবী মানুষের ওপর প্রতিনিয়ত ঘটে চলা আক্রমণের বিরুদ্ধে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ দিল্লীতে ধরনা কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে। রাজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী সহ শিক্ষক মহাশয়গণ, সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীগণ নিদারুন আর্থিক বঞ্চনার শিকার। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্যের কর্মচারী সমাজ প্রতিনিয়ত তাদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা রাজ্য সরকারের বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে লড়াইয়ের ময়দানেই রয়েছে। ২০১৬ সালের ১ ডিসেম্বর পে কমিশন দপ্তর অভিযান, ১১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান সর্বশেষ, পে-কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও দ্রুত কার্যকরী করার দাবিতে বিকাশ ভবন অভিযানে নেমে সরকারী কর্মচারীরা তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল প্রশাসনের তৈরী স্টীলের ব্যারিকেড ভেঙ্গে, তাদের দাবি নিয়ে পে-কমিশনের দপ্তর বিকাশ ভবনের মূল ফটকের কাছে পৌঁছে, পুলিশ প্রশাসনের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে। এই আন্দোলনের জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা-কর্মীদের ওপর খুনের মামলা দায়ের করেছে রাজ্য সরকার, কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে এভাবে ভয় দেখিয়ে তার আন্দোলন সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে গেলে আগামী দিনে প্রয়োজনে আমাদের ধর্মঘটে শামিল হতে হবে।

জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া এটা লজ্জার কথা। ভারতবর্ষে কখনও কোনও রাজ্যে এই পরিমান মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখেনি কোনও রাজ্য সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে কখনও কখনও মহার্ঘভাতা বকেয়া থেকেছে যেমন, তেমনি সে সময়কালে রাজ্য সরকার তার আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি গোচর করে, সময়ে মহার্ঘভাতা দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং চেষ্টা করেছে দ্রুততার সঙ্গে তা মিটিয়ে দেওয়ার। ভুলে গেলে চলবে না তখন কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য সরকার ৩০ শতাংশ রাজস্ব পেত অনেক বোঝানোর পর, আর আজকে ৪২ শতাংশ রাজস্ব পায় রাজ্য সরকার। আর ডি এ বকেয়ায় গোটা দেশে ১ নম্বর। আসলে বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জানান ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে পঞ্চম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল। একবছর সময় ছিল। তার আগেই ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেতন কমিশন তার সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয়। বামফ্রন্ট সরকার সুপারিশের ১১ দিনের মাথায় কর্মচারীদের জন্য আর ১৩ দিনের মাথায় অবসরপ্রাপ্তদের জন্য সুপারিশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বেতন কমিশনে সাধারণ কর্মচারীদের বেতন ৩৫ শতাংশে থেকে ৪০ শতাংশে হারে বেড়েছিল। আর বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে ২০১৫ সালের ২৭নভেম্বর পে-কমিশন গঠিত হয়েছিল ছয় মাসের সময়সীমার মধ্যে বেতন কমিশনের সুপারিশ জমা দেওয়ার জন্য। তারপর তিন দফায় বাড়ানো হয়েছে সময়। চলতি বছরের ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা আছে। গোটা রাজ্যের কর্মচারী সমাজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে দাবি জানাচ্ছে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা সহ অবিলম্বে পে-কমিশনের সুপারিশ প্রদান ও দ্রুত কার্যকর করার।

জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য দাবি প্রস্তাব গ্রহণের পরবর্তীতে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়ে এগোতে চায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তার আগে আগামী ২৬-২৭ জুন কর্মচারীরা রাজ্য জুড়ে দপ্তরে দপ্তরে ব্যাজ পরিধান করবেন। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, বেতন কমিশনের সুপারিশ চেয়ে দুপুর দেড়টা থেকে এক ঘণ্টা বিক্ষোভে শামিল হবেন। এই কর্মসূচীকে সফল করতে গোটা রাজ্য ব্যাপী কর্মী নেতৃত্বকে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 2nd Issue, June '18

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

মেক্সিকোয় লাল ঘোড়া

অশোক রায়

মেক্সিকোর নির্বাচনে জয়ী আন্দ্রেজ ম্যানুয়েল লোপেজ

বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর যখন নানান নতুন ঘটনার সাক্ষী সেই উত্তেজনার মাঝেই মেক্সিকোর সাধারণ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন বামপন্থী লোপেজ। পুরো নাম আন্দ্রেজ ম্যানুয়েল লোপেজ ও ব্রাভোর, যার পরিচিতি অ্যামেলো নামে। এবারের নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীর জয়ের কারিগর আর্থ-সামাজিক ভাবে হাঁপিয়ে ওঠা সে দেশের মানুষ হলেও, এই জয় প্রকৃত পক্ষে গোটা বিশ্বের মেহনতী মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন। একইসাথে বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সমস্ত হিংস্রশক্তির কাছে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্টের নীতির কড়া সমালোচক এবং প্রতিবাদের মুখ হয়ে ওঠা অ্যামেলোর পরাজয় চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন নির্বাচনে জয়ের পরে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

বর্তমান কালপর্বে সবথেকে হৃদয়বিদারক যে অভিবাসন নীতি মার্কিন সরকার গ্রহন করেছে এবং একই সাথে নিজের দেশে বাণিজ্যের ঘেরাটোপ নীতি চালু করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের মেহনতি মানুষের প্রকৃত জবাব ফুটে উঠেছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে। মার্কিন অবরোধের সবথেকে নোংরা কার্যক্রমের সাক্ষী মেক্সিকোর মানুষ। বেশ কয়েক বছর ধরে তারা দেখছে বড় লোক আমেরিকা কি চরম ঔদ্ধত্যে দুদেশের মধ্যে একদিক খাড়া (মেক্সিকোর দিকে) সুবিশাল উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করে চলেছে।

উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার যোগসূত্র সৃষ্টিকারী হলো এই মাছের আকৃতির মেক্সিকো যা সোভিয়েত বিপ্লবের বছরই, অর্থাৎ ১৯১৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সংবিধান গ্রহণ করে। এর দক্ষিণে গুয়াতেমালা, বেলিজ, এল সালভাদোর, হুন্ডুরাস, নিকারাগুয়ার মতো ছোট ছোট দেশ। কিছুটা দূরে কিউবা জ্বলজ্বল করছে লাল পতাকায়। ১৫২১ সালে এখানে স্পেন উপনিবেশ স্থাপন করে স্থানীয় মায়া সভ্যতাকে প্রায় ধ্বংস করেই। তারপর দীর্ঘ ৩০০ বছরের পরাধীনতা থেকে ১৮২১ সালে স্বাধীনতা অর্জন। তারপর ১৯১০ সালে মেক্সিকান বিপ্লবের সাফল্য, যা সংহত হয় ১৯১৭ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি নতুন সংবিধান গ্রহনের মাধ্যমে। যাতে বলা হয় ৫০০ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধির ফেডারেল চেম্বার আর ১২৮ জনের উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। সর্বত্রই লোপেজের ২০১৪ সালে গড়া দল মোরেনার প্রার্থীদের জয়জয়কার। ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন লোপেজ, যা নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে দ্বিগুণের বেশি ভোট। ২০০৬ এবং ২০১২ এর নির্বাচনে হেরে গেলেও এবারে মানুষের আশার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারের মুখ হিসাবে উঠে আসা লোপেজকে কার্যত মাফিয়া রাজের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ মসিহারূপে বিচার করেছেন মেক্সিকোর চরম যন্ত্রনাক্লিষ্ট জনগণ। নির্বাচনী প্রচারে ২০০০ সাল থেকে মেক্সিকো সিটির মেয়র মানুষের বিপুল সমর্থন লাভ করার ফলে একটা পূর্বাভাস ছিলই আর তাতেই আতঙ্কিত দুষ্কৃতীরা চরম হিংস্র পথ নেয়া। ১৪৫ জনের বেশি রাজনৈতিক নেতা কর্মী খুন হয়েছেন এই মাফিয়ারাজের হাতে। এদের জীবনের বিনিময়ে দেশে শান্তি আর সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করার দায় লোপেজের ওপর বর্তেছে। ভারতবর্ষের প্রায় ৩ গুণ আয়তন। আর মাত্র ১৪ কোটির কম মানুষের দেশে সম্পদের বণ্টনে যে চরম বৈষম্য বর্তমান, তা থেকে দেশকে কতটা মুক্ত করতে সক্ষম হবেন নতুন প্রেসিডেন্ট তা আগামী সময়ই বলবে। তবে যে নীতির জন্য দুর্নীতি আর মাফিয়ারাজ কায়েম হয়েছে সেই নয়াউদারনীতির বিরুদ্ধে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করেই এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া সম্ভব। নয়া উদার অর্থনীতির সাথে কোনরকম সমঝোতায়, প্রকৃতপক্ষে সেদেশের মানুষের বিশেষত মেহনতী মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে না।

গোটা ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে একটা লাল ঝড় বয়ে চলেছে। ভেনেজুয়েলা তার সর্বশক্তি দিয়ে মার্কিন চক্রান্তকে ব্যর্থ করে মাদুরোকে পুনর্নির্বাচিত করেছে। ব্রাজিলে দিলমা রুসেফ রাষ্ট্রপতি আছেন, তবে নানান চক্রান্তের শিকার হয়ে সে দেশের শ্রমিক প্রতিনিধি লুলাকে জেলে যেতে হয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির নাক কাটা গেলেও দ্রুত লোপেজকে অভিনন্দন জানাতে ভুল করেননি। কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, যিনি ইজ্রায়েলের নেতার ভাল ঘুম হলেও অভিনন্দন পাঠাতে ট্যুইট করেন, তিনি অন্ততঃ কোন অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন কিনা জানা নেই। লোপেজের জয়ে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, কিউবার রাষ্ট্রপতি মিগুয়েল দিয়াজ কানেল, বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ইভো মোলারেস, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি মাদুরো, ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি লেনিন মোরেনো, এল সালভাডোরের রাষ্ট্রপতি সালভাদোর সাঞ্চেজ, কোস্টারিকার রাষ্ট্রপতি কার্লোস আলভারালো প্রমুখ। এছাড়া দেশ বিদেশের শ্রমজীবী মানুষের অভিনন্দন লোপেজের সাথেই থাকবে। সেই আস্থাতেই বলীয়ান হয়ে মেক্সিকোর মানুষের প্রকৃতবন্ধু হয়ে উঠুন নতুন রাষ্ট্রপতি একই সাথে গোটা বিশ্বকে পথ দেখান এই প্রত্যাশা অবশ্যই থাকছে।

২ জুলাই ২০১৮ বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে ব্রাজিলের কাছে হেরে গেলেও দেশের জনগণের ময়দানে জয়ী হয়েছে মেক্সিকো। এই জয় বিশ্বকাপের আসর থেকে ছিটকে যাওয়ার যন্ত্রনাকে অবশ্যই উপশম করবে সন্দেহ নেই। □

১২ই জুলাই কমিটির ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-র সভা

দেবাশীষ রায়

শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক-আন্দোলনের যুক্ত কমিটির ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভা বিগত ১২ই জুলাই, ২০১৮ কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী হলে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই জুলাই কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনুপ চক্রবর্তী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং এবিপিটিএ-র সাধারণ সম্পাদক সমর চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করে। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রারম্ভিক বক্তব্যে ১২ই জুলাই কমিটিণ অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টচার্য বলেন, গোটা রাজ্য জুড়েই ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রতিপালিত হচ্ছে। এক ভয়ংকর আক্রমণের মুখোমুখি গোটা দেশের মানুষ। একদিকে অর্থনৈতিকভাবে তারা আক্রান্ত হচ্ছে, অপরদিকে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র ব্যবস্থা চরম আক্রমণের সম্মুখীন। মোদি সরকারের একটার পর একটা পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত-নিষ্পেষিত হচ্ছেন। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে অবস্থা আরো ভয়ংকর। কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র সর্বত্রই চরম নৈরাজ্য চলছে। এই নৈরাজ্য ও মানুষ মারা অর্থনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চলছে কিন্তু এই লড়াইয়ের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করতে হবে আমাদের, এই লড়াইতে জয়ী হতে গেলে সর্বাগ্রে খুঁজে বের করতে হবে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণকে এবং তাকে সমূলে উৎপাটিত করার লক্ষ্যেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। গোটা দেশের ক্ষেত্রে আক্রান্ত কৃষকরা দারুণভাবে লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন, শ্রমিকরা লাগাতার আন্দোলন, সংগ্রাম-ধর্মঘট করছেন, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সংসদ অভিযান করবেন। শ্রমিক-কর্মচারী হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির এগিয়ে থাকা অংশ হিসাবে আমাদেরকেও বিগত ৫২ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই লড়াইয়ের ময়দানে সঠিক ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে, প্রত্যেক সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে আমাদের পৌঁছাতে হবে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে।

৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সভার মূল আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'অর্থনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য'— আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অনুনয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নয়া উদার অর্থনীতি হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক বেপরোয়া পদক্ষেপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির চাপে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুনরায় দেশ দখলের নতুন কৌশল বের করে ফেলেছে, দেশে দেশে অর্থনীতিকে দখল করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশ সহ বিভিন্ন দেশে বাজেট তৈরি থেকে দেশে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে পুঁজিবাদ। আর্থিক সংস্কারের নামে দেশের কৃষিক্ষেত্রে আক্রমণ চলছে, চরম নিপীড়ণ নেমে এসেছে শ্রমজীবি মানুষের ওপর, সমাজতান্ত্রিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির চাপে দেশে দেশে গড়ে ওঠা জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিষ্ঠুরভাবে মালিকের পক্ষে বা শোষকের পক্ষে, আইনের পরিবর্তন ঘঠানো হচ্ছে। দেশের বাজেটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঋণের জ্বালায় জর্জরিত হয়েও দেশের মানুষের মুখে প্রতিদিন খাদ্য তুলে দেওয়া কৃষকের ঋণ ছাড়ের পরিবর্তে দেশের মুষ্টিমেয় কর্পোরেটদের লক্ষ-কোটি টাকা ছাড়া দেয়া। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব লাভজনক সংখ্যার বেসরকারীকরণ শুধু নয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ, বিদ্যুৎক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ফলে দামবৃদ্ধি, রেলে পিপিপি মডেল, ব্যাঙ্কিং শিল্পে আক্রমণ এককথায় পুঁজিবাদের নির্মম আক্রমণ চলছে। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া গ্রহণ। ইতিহাস গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসে-এর উদ্বোধকের ভাষণে দেশের বর্তমান সরকার তার ফ্যাসিবাদী চেহারাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বিচারব্যবস্থাও আজ আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যেও শ্রমজীবি মানুষ, মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ চরমভাবে আক্রান্ত। দেশের সরকারের মতো রাজ্যের বর্তমান সরকারও একইভাবে রাজ্য শাসন চালছে। এর বিরুদ্ধে লড়াইতে জয়ী হতে হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-এর ভাবাদর্শকে পাথেয় করে শ্রমিক-কৃষককে উদ্বুদ্ধ করে তীব্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি
প্রথম রাজ্য মহিলা
কনভেনশন
৮-৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
কর্মচারী ভবন
অরবিন্দ সভাকক্ষ
১০-এ শাঁখারিটোলা স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০১৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রমাণ করলেন একটি শাশ্বত সত্য—

অধিকার কে কাকে দেয় অধিকার কেড়ে নিতে হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে অনুজপ্রতিম লড়াকু ছাত্র-ছাত্রীবন্ধুদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।